বিশেষ ক্রোড়পত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

# পশ্চিমবঙ্গ

জুলাই-নভেম্বর ২০১৯

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

# ২৫-এ পা

ঘাটালের বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের
দু'শোতম জন্মবার্ষিকীর শুভ সূচনায় মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

# পশ্চিমবঙ্গ

রাজ্য সরকারের মুখপত্র

বর্ষ-৫২ সংখ্যা ৩-৭

জুলাই-নভেম্বর ২০১৯

মূল্য : ৫০ টাকা


## সূ • চি • প • ত্র


উন্নয়নের অভিমুখ ৪

ফটোফিচার ৮

সংবাদ প্রতিবেদন

বাংলায় বুলবুল ১৪

আন্তরিকতাই মহান করেছে চলচ্চিত্র উৎসবকে: মুখ্যমন্ত্রী ১৮

দুই বাংলার মেলবন্ধনে গোলাপী বলের ক্রিকেট ২৬

বিশেষ ক্রোড়পত্র ৩১


কাজেই যাঁরা মূর্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের মূর্তি আমাদের হৃদয়ে অনন্তকাল স্থায়ী হয়ে থাকে। আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যাঁদের মুখ মনে পড়ে তাঁদের জন্য আলাদা করে স্মরণ সংখ্যা বা স্মরণ-উৎসবের হয়তো প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আমরা ততটা গভীরভাবে এঁদের জীবন-চর্চায় নিষ্ঠাবান হই না সর্বদা। তাই আমাদের মূর্তিও গড়তে হয়। স্মরণ-অনুষ্ঠান ও স্মরণ সংখ্যার প্রয়োজন পড়ে। মাত্র দু'শো বছরের যেসব ঘটনা বাংলার বুকে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে, আমরা পিছন ফিরে সেই পরম্পরাকে একটু দেখে নেওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রাক্ দ্বি-শত-জন্মবর্ষ উপলক্ষে সেই প্রয়াসই নেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে।

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার এই সংখ্যায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ এরই একটি অঙ্গ।

উপদেষ্টা সম্পাদক
**প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী**

প্রধান সম্পাদক
**আলোকোজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**

সম্পাদক
**সুপ্রিয়া রায়**

সহ-সম্পাদক
**রাতুল দত্ত সর্বাণী আচার্য**

প্রচ্ছদ পরিচিতি
**২৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্‌বোধন**

প্রচ্ছদ অলংকরণ- **সুরজিৎ পাল**

**সম্পাদকীয় শাখা,** তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মহাকরণ (চতুর্থ তল), কলকাতা ৭০০ ০০১
দূরভাষ (০৩৩) ২২৫৪ ৫০৮৬ ই-মেল : editbengali@gmail.com
**বিতরণ শাখা:** ১১৮, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা ৭০০ ০১০, দূরভাষ (০৩৩) ২৩৭২ ০৩৮৪

**পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষে তথ্য অধিকর্তা কর্তৃক প্রকাশিত এবং**
**বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড** (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অধিগৃহীত একটি সংস্থা) **১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত**

বাংলার দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সভ্যতাকে মুছে ফেলা যাবে না: মুখ্যমন্ত্রী ৩৪

বাংলার ঈশ্বর—*সুপ্রিয়া রায়* ৩৬

দ্বিগুণজীবিত পৌরুষ—*অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়* ৪৪

বাংলার নবজাগৃতির প্রথম আধুনিক পুরুষ বিদ্যাসাগর—*স্বপন মুখোপাধ্যায়* ৫৪

সাগরে আর এক ঢেউ—*কমলকুমার কুণ্ডু* ৬৪

প্রান্তিক মানুষের বন্ধু বিদ্যাসাগর—*বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়* ৭৪

শৈশবের মেঘদূত ভাষাসাগর বিদ্যাসাগর—*রাতুল দত্ত* ৮২

বিদ্যাসাগর রচিত-সম্পাদিত পুস্তকপঞ্জি ৯৫

শব্দসাগর বিদ্যাসাগর—*রাতুল দত্ত* ৯৬

উনিশ শতকে বাঙালির ব্যবসা ও বিদ্যাসাগর—*সর্বাণী আচার্য* ১০০

নূতন ভুবন, নূতন আলোক—*সাহানা নাগচৌধুরী* ১১০

বিদ্যাসাগর অন্বেষণে—*দীপেন্দু চৌধুরী* ১২২

সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ১২৮

কার্মাটারে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত স্টেশন

# স • ম্পা • দ • কী • য়

সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলাকে চিরকালই আলাদা সম্মান দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে সার্বিক জাগরণের মধ্য দিয়ে এক নতুন জীবন সংস্কৃতির জন্ম হয়। বাংলায় এই কাজ প্রথম শুরু হয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রয়াসে। বাংলায় সেই নবজাগরণের প্রেক্ষাপটেই আজও কর্মসূচি গৃহীত ও রূপায়িত হয়, বিশেষত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

বাংলায় ওইসময় নারী উন্নয়নে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁর দ্বিশতজন্মবর্ষের সূচনালগ্নে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হল। একগুচ্ছ নিবন্ধ প্রকাশ করা হল। নিবন্ধলেখকের মতামত নিজস্ব।

এছাড়া নিয়মিত বিভাগগুলিও থাকছে এই সংখ্যায়। অনিচ্ছাকৃত যে কোনও ত্রুটিই মার্জনীয়।

# উন্নয়নের অভিমুখে

**০১/০৭/২০১৯**

- চিকিৎসক দিবস উপলক্ষে এসএসকেএম হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। সম্মানীয় চিকিৎসকদের এদিন তিনি 'বিশিষ্ট চিকিৎসা সম্মান' প্রদান করেন। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গের ফার্স্ট লেভেল –১ ট্রমা কেয়ার সেন্টার-এর উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ডাক্তারদের ভূয়সী প্রশংসা ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এদিন তিনি।

**০২/০৭/২০১৯**

- ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্যে তপশিলি জাতির উন্নয়নে জাতীয় স্তর থেকে স্বীকৃতি পেল বাংলা। তপশিলি উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গের হাতে উঠে এসেছে সেরার শিরোপা। এই সাফল্যের জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

**০৩/০৭/২০১৯**

- অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ১০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত রাখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এই সংরক্ষণ রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

**০৪/০৭/২০১৯**

- কলকাতায় ইস্কন আয়োজিত রথযাত্রার শুভ সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন তিনি হুগলির মাহেশের রথযাত্রা উৎসবেও অংশ নেন।

**০৮/০৭/২০১৯**

- তৃতীয় বর্ষে পড়ল রাজ্য সরকারের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ ' প্রকল্প। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে এই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন তিনি জানান, রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১৭% কমেছে এবং ২৭% দুর্ঘটনা কমেছে। এই উপলক্ষে কলকাতা পুলিশের তরফে সচেতনামূলক বাইক মিছিলের আয়োজন করা হয়।

**১২/০৭/২০১৯**

- 'জল সংরক্ষণ দিবস' উপলক্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে মেয়ো রোডের গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত একটি পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। জলের অপচয় থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান এদিন তিনি।

**১৪/০৭/২০১৯**

- 'বন মহোৎসব' উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

**১৫/০৭/২০১৯**

- স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ঋণ প্রদানের নিরিখে দেশের মধ্যে সেরা পশ্চিমবঙ্গ, জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। নাবার্ডের (NABARD) তথ্য অনুযায়ী ৯৭,৫৩৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়েছে,পশ্চিমবঙ্গ সরকার যার ফলে বিপুল হারে বেড়েছে কর্মসংস্থান ও আয়। মহিলারাই বেশি উপকৃত বলে জানান তিনি।

**১৮/০৭/২০১৯**

- এদিন বানতলায় একগুচ্ছ প্রকল্প উদ্বোধন করার পাশাপাশি বিশ্বের অন্যতম ইন্টিগ্রেটেড চর্মনগরী 'কর্ম দিগন্ত'-এর শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এই চর্মনগরীতে চর্মজাত পণ্য, ফুটওয়্যার পার্ক, মাইক্রো ট্যানার হাব, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সহায়তা কেন্দ্র তৈরি করা হবে।

**২৪/০৭/২০১৯**

- মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

- নজরুল মঞ্চে এদিন এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'চলচ্চিত্র সম্মান' প্রদান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। তাঁর একান্ত উদ্যোগে ২০১২ সাল থেকে এই পুরষ্কার প্রদান করা শুরু হয়। এক মনোগ্রাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পরিচালিত হয় এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান। বাংলা চলচ্চিত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

**২৬/০৭/২০১৯**

- মধ্যমগ্রামের নজরুল শতবার্ষিকী সদনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

**২৮/০৭/২০১৯**

- এযাবৎ রাজ্যে অপর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে চাষবাসের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। এ হেন পরিস্থিতিতে রাজ্য কৃষি দফতরকে বিকল্প কৃষিব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। ইতিমধ্যেই কৃষকদের মধ্যে জল সংরক্ষণ করা ও অপচয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে।

**৩১/০৭/২০১৯**

- সরকারি হাসপাতালগুলিতে সবরকম সুপার স্পেশালিটি পরিষেবা এক ছাতার তলায় আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে এ ধরনের পরিষেবার সূচনা করা হচ্ছে। বেসরকারি হাসপাতালের তুলনায় অনেক কম খরচে একই রকম উচ্চ মানের চিকিৎসা পাবেন সাধারণ মানুষ।

**০১/০৮/২০১৯**

- 'সবুজ বাঁচাও'-এর আবেদন নিয়ে পথে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। পদযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলর-সহ রাজ্যের একাধিক পদস্থ আধিকারিক। দুপুর ৩টে নাগাদ বিড়লা তারামণ্ডলের সামনে থেকে শুরু হয় পদযাত্রা, শেষ হয় নজরুল মঞ্চে গিয়ে। সমাজের সব শ্রেণীর মানুষজন ওই পদযাত্রায় অংশ নেন।

**১৩/০৮/২০১৯**

- বাগবাজারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। ষোড়শ শতকের সন্ত এবং বৈষ্ণব প্রথার প্রতিষ্ঠাতা চৈতন্যদেবের ওপর নির্মিত এই সংগ্রহশালা। এই অনুষ্ঠানের আয়োজক গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার। চৈতন্যদেবের শান্তি ও ভালোবাসার বার্তা ছড়াতেই এই সংগ্রহশালা।

**১৪/০৮/২০১৯**

- মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জীর উপস্থিতিতে কলকাতার নজরুল মঞ্চে ষষ্ঠ 'কন্যাশ্রী দিবস' পালিত হল। ইতিমধ্যেই সারা রাজ্যের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৬০ লক্ষেরও বেশি মেয়ের ক্ষমতায়ন করেছে এই প্রকল্প। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন।

**১৫/০৮/২০১৯**

- ৭৩তম স্বাধীনতা দিবসে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। সমগ্র দেশে ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার বার্তা দেন তিনি। এদিন কলকাতার রেড রোডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন তিনি বলেন, 'গণতন্ত্রই দেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এদিনের অনুষ্ঠানে আট পুলিশকর্তাকে পদক প্রদান করেন তিনি। প্রথামাফিক কলকাতা পুলিশের কুচকাওয়াজ ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন দফতরের সুসজ্জিত ট্যাবলো। সমাজ সচেতনতার বার্তা, জল অপচয় বন্ধ, পথ নিরাপত্তা, পরিবেশ সচেতনতা কিংবা পরিবেশ দূষণ কমানোর উপায়—এই প্রথম স্বাধীনতা দিবসের ট্যাবলোয় জায়গা করে নিল এমনই সব বিষয়। এবারের অনুষ্ঠানের থিম ছিল 'মোদের গর্ব বাংলা'। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নেয় এদিনের অনুষ্ঠানে।

**১৬/০৮/২০১৯**

- হাওড়ায় শ্রমনিবিড় শিল্প পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থান বিষয়ে একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা ও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এদিন নবান্ন সভাঘর থেকে, খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় 'খাদ্যশ্রী ভবনে'র উদ্বোধন করেন তিনি। প্রতি বছর ২৬শে ফেব্রুয়ারী খাদ্যসাথী দিবস পালন করে রাজ্য সরকার। খাদ্যসাথী প্রকল্প বাংলার এক অন্যতম সফল প্রকল্প। রাজ্যের প্রায় ৯ কোটি মানুষকে ২টাকা কিলো দরে চাল দেওয়া হয়।

**১৯/০৮/২০১৯**

- মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী এদিন হাওড়ার জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করে, জেলার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান নেন। এদিন, স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনেন তিনি।

**২০/০৮/২০১৯**

- নিউ দীঘায় বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। কলকাতা থেকে স্বল্প দূরত্বে দীঘা একটি সুন্দর পর্যটন কেন্দ্র। সবুজে ঘেরা ৫ একর জমির ওপর অবস্থিত এই অত্যাধুনিক 'দীঘাশ্রী' বাংলা আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত কনফারেন্স থেকে শুরু করে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এখানে থাকছে একটি প্রদর্শনী কেন্দ্র, ৩০০ আসনের একটি আলোচনা কেন্দ্র, একটি সম্মেলন কক্ষ এবং এক হাজার আসনের একটি আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ।

**২১/০৮/২০১৯**

- পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

**২৪/০৮/২০১৯**

- কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও স্বনামধন্য আইনজীবী অরুণ জেটলির প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

**২৬/০৮/২০১৯**

- পূর্ব বর্ধমান জেলার সংস্কৃতি লোকমঞ্চে জেলা আধিকারিকদের সঙ্গে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। জেলার উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান নেন তিনি। পরে তিনি তাঁর যাত্রাপথে একটি সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কিছু সময় কাটান। এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানের আলিশা বৈকণ্ঠপুর গ্রামে গিয়ে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত হন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসী মানুষদের অনুভূতির কথা সরাসরি শুনতে পারা এক মনোরম অভিজ্ঞতা, বলেন তিনি।

**২৭/০৮/২০১৯**

- হুগলি জেলার গুরাপে এদিন প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। জেলা আধিকারিকদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুলিশ আধিকারিকরাও। বৈঠকে, জেলার উন্নয়ন কার্যের খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী।

**৩০/০৮/২০১৯**

- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের আধিকারিকদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল থেকে হাসপাতালে প্রসবের জন্যে আসা প্রসূতি মহিলাদের জন্যে বিশেষ প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করে 'স্কচ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করে এই দফতর।

**০৫/০৯/২০১৯**

- শিক্ষক দিবসে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। শিক্ষক দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এ বছরও শিক্ষারত্ন সম্মান প্রদান করেন তিনি। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ডঃ রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মান প্রদান করা হয় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষকদের।

**০৬/০৯/২০১৯**

- বাংলা টেলিভিশন বিনোদন জগতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ টেলি অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হলেন বিশিষ্ট কলাকুশলীরা। এদিন নজরুল মঞ্চে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, এই পুরস্কার বিতরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী।

**১৮/০৯/২০১৯**

- ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে আবারও ভারত সরকার কর্তৃক, মূলত ভুট্টা উৎপাদনের জন্যে 'কৃষিকর্মণ' পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জ্জী। এর আগে ২০১১-১২ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত পরপর পাঁচ বছর বাংলাই এই পুরস্কার পেয়েছে।

মা আসেন। মা যান। এই আসা-যাওয়ার মাঝখানটাতেই বাঙালি মেতে ওঠে উৎসবে। বিশ্বজুড়ে। যে খানে যে প্রান্তেই থাকুক না কেন কিন্তু বাংলায় মায়ের আসা যাওয়া বাংলার সবটুকুকে জুড়ে থাকে। কর্মব্যস্ত আধুনিক জীবনেও বাঙালির দুর্গোৎসব ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে। দশমীর পরেও চলে এর রেশ। এখন কলকাতার দুর্গা কার্নিভাল বিশ্ব উৎসবের আঙিনায় নজর কেড়ে বসে আছে। তারই এক ঝলক এই ছবিতে।

# ফটোফিচার

রথের রশি টানছেন মুখ্যমন্ত্রী

শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম (বাগবাজার)-এর উদ্‌বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী

## গুরু নানকের জন্মদিনে প্রার্থনারত মুখ্যমন্ত্রী

দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার কাজের তদারকি করছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দীঘায় অত্যাধুনিক কনভেনশন সেন্টার–এর
শুভ উদ্বোধন করলেন
পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
স্থান: দীঘা কনভেনশন সেন্টার | তারিখ: ২০ আগস্ট ২০১৯ | সময়: দুপুর ৩টে

## সংবাদ প্রতিবেদন

# বাংলায় বুলবুল

বিপর্যস্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে মুখ্যসচিব বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীবর্গ, জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আছেন। শুধু ত্রাণ বা অর্থ সাহায্য নয় বিপর্যয় পরবর্তী সময়ে দ্রুত উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকর পদক্ষেপের জন্য জরুরী বৈঠক চলে। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অভাব অভিযোগের কথা শোনেন তিনি। রাজ্যে বুলবুল আছড়ে পরার প্রতিটি মুহূর্তে নবান্ন-এ সারারাত জেগে বিপর্যয় মোকাবিলার যে গুরুদায়িত্ব পালনের যে নজির সৃষ্টি করলেন সেটা তারিফযোগ্য বলেই স্বীকৃত হয়নি, রাজ্যবাসীর কাছে বড়ো আস্থার বিষয় হয়ে উঠেছে। প্রায় ২ লক্ষের কাছাকাছি মানুষের প্রাণরক্ষার যে ব্যবস্থা সেই রাতে করা সম্ভব হয়েছিল তাও এক কথায় নজিরবিহীন।

সেই রাত থেকেই বিপর্যস্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে আছে সরকার। প্রাণহানি, ঘরভাঙা, ফসলহানি এসবের মোকাবিলায় সার্বিক সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে সরকার। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকায় আঘাত হেনেছে বুলবুল। এই আঘাত এসেছে রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিতেও যার ফলে কম বেশি সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই ক্ষতির মোকাবিলায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

# আন্তরিকতাই মহান করেছে চলচ্চিত্র উৎসবকে: মুখ্যমন্ত্রী

# ২৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

সিনেমার উৎসব—উৎসবের সিনেমা। এই নিয়েই মেতে রইল শহর কলকাতা। ৮ থেকে ১৫ নভেম্বর। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব—এ বছর পা দিল পঁচিশতম বর্ষে।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে এক ঝলমলে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উৎসবের উদ্‌বোধন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজির ছিলেন জনপ্রিয় অভিনেতা, পরিচালকেরা। উল্লেখ্য, বিশ্বখ্যাত জার্মান পরিচালক অস্কারজয়ী ভোলকার স্কলনডর্ফ, স্লোভাকিয়ার পরিচালক ডুসান হানাক ও আমেরিকার অভিনেত্রী অ্যান্ডি ম্যাকডাওয়েল। ছিলেন সন্দীপ রায়, গৌতম ঘোষ, মহেশ ভাট, উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান রাজ চক্রবর্তী এবং টালিগঞ্জ সিনেমা মহলের এক ঝাঁক তারকা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে দেখানো হয় একটি প্রোমোশনাল ছবি। পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শুটিং লোকেশনগুলি ছিল এর বিষয়। ২৫ তম চলচ্চিত্র উৎসবের থিম মিউজিক এবং লোগো ফিল্মের আবহ সংগীত পরিচালনা করেছেন পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ।

সূচনাপর্বে বিশেষ নজর কাড়ে তনুশ্রী শংকর ও তাঁর ট্রুপের নৃত্য প্রদর্শন। রাজ চক্রবর্তী স্বাগত ভাষণ পাঠ করেন। আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন যথারীতি বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর শাহরুখ খান। অমিতাভ বচ্চন এ বছর অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে, এবারের অনুষ্ঠানে নতুন সংযোজন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট অভিনেত্রী রাখি গুলজার।

তারকা ঝলমলে সন্ধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগাগোড়াই ছিলেন সাবলীল। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারে এক মুহূর্তেই চেনা থেকে অপরিচিত সবাই আপন। বিশ্ব আঙিনায় তিনি তুলে ধরলেন একাধারে বাংলার সর্বভারতীয় এবং বিশ্বজনীন রূপ। বললেন, 'আমরা কাউকে হিংসা করি না। কিন্তু এগিয়ে

যেতে চাই। কোনও প্রতিযোগিতার মধ্যে না গিয়ে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করি। আমাদের বাংলা খেলাধুলো, বিজ্ঞান, সিনেমা—সবই দিয়েছে দেশকে, বিশ্বকেও। সংস্কৃতির রাজধানী কলকাতা থেকে বাংলা সবাইকে নিয়ে চলতে চায়।'

এবারের উৎসবে দেখানো হয় রাখি অভিনীত 'নির্বাণ' ছবিটি। শাহরুখের হাত ধরে মঞ্চে আসেন তিনি। বললেন 'আমি বাংলার মেয়ে, ধমনীতে বাংলার রক্ত বইছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে কৃতজ্ঞ। অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে করা যায়, দেখিয়ে দিল কলকাতা।' শাহরুখকে তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে বাংলা শেখাব।' এরপরেই মঞ্চে একটি মজার মুহূর্ত তৈরি হয়। রাখির নির্দেশে শাহরুখ বলে ওঠেন, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা'। দর্শক আসন থেকে তখন হাত তালির বন্যা।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় অচেনা পরিবেশেও এদিন সাবলীল থাকার চেষ্টা করেছেন। আমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, 'ধন্যবাদ দিদি, একটা আলাদা মঞ্চে আমি এসেছি। এই মঞ্চে ঠিক অভ্যস্ত নই।' তাঁর বক্তব্যেও উঠে আসে ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, গোবিন্দ নিহালনি, আদুর গোপালকৃষ্ণণ-এর নাম।

সৌরভ ও শাহরুখকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলে উঠলেন, 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম সৌরভ আর শাহরুখ'—আবারও দর্শকেরা যেন ফেটে পড়লেন উচ্ছ্বাসে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, 'উৎসবকে সাজানোর ব্যাপারে শাহরুখ, রাখিজি, মহেশজি সবাই সাহায্য

করেছেন। এত সুন্দর চলচ্চিত্র উৎসব আর কোথাও হয় না। এর কারণ, আমাদের আন্তরিকতা আছে। টাকা দিয়ে আড়ম্বর হয় না।'

দুর্গাপুজোর কার্নিভাল দেখতে শাহরুখ, মহেশ ভাট থেকে অ্যান্ডি ম্যাকডাওয়েল সবাইকেই আমন্ত্রণ জানান তিনি।

ভোলকার স্কলনডর্ফ বলেন, কলকাতায় এসে আমি অভিভূত। এখানকার মানুষ, এখানকার সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।.... এতদিন ভারত সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল ভাসা ভাসা। আমার কোনও ছবির শুটিং হয়তো এখানেও হতে পারে।'

মহেশ ভাট তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন সাম্প্রতিক সময়ের কথা। বললেন, 'বিভেদকামী আর বিপজ্জনক এক সময়ের বাসিন্দা আমরা। এই সময়ে কাহিনি কথক আর চলচ্চিত্র নির্মাতার গুরুত্ব সবথেকে বেশি। তাঁরা উজ্জ্বল আগামী দিনের রূপকার। যাঁরা আমাদের এক ভাষা ব্যবহারে বাধ্য করতে চান, তাঁরা পরাজিত হবেন, জয়ী হবে বিভিন্ন নিজস্ব ভাষায় কথা বলার অধিকার।'

উদ্‌বোধনী ছবি, নব রূপে পাওয়া গুপী গাইন বাঘা বাইন।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানেও একই মহিমায় পাওয়া গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে। বলে উঠলেন, 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমরা সব সময় রক্ষা করব।' ১৫ নভেম্বর নজরুল মঞ্চে ২৫ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সমাপনে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যই ছুঁয়ে গেল উপস্থিত তারকা থেকে সাধারণ মানুষকে। তিনি আরও বলেন, 'চলচ্চিত্র উৎসব মনুষ্যত্বের উদ্‌যাপন। সব মানুষকে নিয়ে, সকলের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে আমরা উৎসব করি। কলকাতা চিরদিনই এই বহুত্ববাদী ঐতিহ্যকে সম্মান দিয়েছে। আন্তরিকতার গুণে কলকাতা বিশ্বের মধুরতম শহর।

সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি শাবানা আজমিও মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বলেন, 'আমি যে পরিবেশে বড়ো হয়েছি সেখানে সবসময়েই শিখেছি, সকলের অভিমতের প্রতি সমান মনোযোগী হতে। বহুত্ববাদ আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। আমাদের সংবিধান সব জাতি, ধর্ম, ভাষার মানুষের সমান অধিকারকে সুনিশ্চিত করেছে। যেসব ছবি বাণিজ্যিক ধারার নয়, সেইসব ছবিকে বড়ো অঙ্কের পুরস্কার মূল্য দিয়ে, বিকল্প ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে উৎসাহিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

এদিনের অনুষ্ঠানে অমিতাভ বচ্চনের একটি ভিডিও বার্তা প্রচারিত হয়। তাঁর কথার-ও মূল সুর ছিল, 'বহিষ্কার নয়, অন্তর্ভুক্তি'।

এবারে পুরস্কারের পালা। আন্তর্জাতিক বিভাগে সেরা—গুয়াতেমালা-র ছবি 'দ্য উইপিং উওম্যান'। ভারতীয় ভাষায় সেরা—'মাইঘাট (ক্রাইম নম্বর ১০৩-২০০৫)'। আন্তর্জাতিক বিভাগে সেরা পরিচালকের সম্মান পেলেন চেক রিপাবলিকের ছবি

'পেইন্টেড বার্ড'-এর পরিচালক। নেটপ্যাক অ্যাওয়ার্ড জিতে নিল আদিত্য কৃপালনির ছবি 'দেবী অউর হিরো'। সেরা তথ্যচিত্র গৌরব পুরী নির্মিত 'অ্যাব্রিজড্'। সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি, সামার র‍্যাপসডি। পরিচালক—শ্রাবণ কাটিকানেনি।

৭৬টি দেশের ২১৩টি কাহিনিচিত্র দেখানো হল এবারের উৎসবে। ফোকাস কান্ট্রি ছিল জার্মানি। সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা দিয়েছেন প্রবাদ প্রতিম চলচ্চিত্র পরিচালক কুমার সাহানি।

অপেক্ষা আবার পরের বছরের জন্য।

# দুই বাংলার মেলবন্ধনে গোলাপী বলের ক্রিকেট

ABURRA
TURF

হাজারো ইতিহাসের সাক্ষী ইডেন গার্ডেন্স আবারও এক নতুন সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হয়ে রইল শুক্রবার, ২২ নভেম্বর ক্রিকেটপ্রেমী এবং তারকায় ঠাসা স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে গেল ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন এক যুগ। এদেশে গোলাপি বলে রাতদিনের প্রথম টেস্ট আর বল হাতে নতুন এই পর্বের সূচনা করলেন ভারতীয় দলের নির্ভরযোগ্য বোলার ইশান্ত শর্মা। প্রতিপক্ষ — প্রতিবেশী বাংলাদেশ।

এর আগে একসঙ্গে ঘণ্টা বাজিয়ে টেস্টের সূচনা করলেন দুই বাংলার দুই প্রধান শেখ হাসিনা ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ মুদ্রায় হল টস। কলকাতা পুলিশের ব্যান্ডের

তালে বেজে উঠল দুই দেশের জাতীয় সংগীত। দুদলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তখন হাজির ৪০ জন এইডস আক্রান্ত শিশু। ঐতিহাসিক এই দিন রাতের টেস্টম্যাচের শুরুতেই এদিন বরণ করে নেওয়া হয় অতীত ও বর্তমানের বহু ক্রীড়াবিদকে।

ম্যাচ শুরুর বহুক্ষণ আগেই ইডেনের গ্যালারি এদিন ভরে উঠেছিল দর্শকে। দুদেশের ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপপর্ব সমাধা হয়। ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি নিজে দলের প্রত্যেকের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ও শেখ হাসিনার পরিচয় করিয়ে দেন। ম্যাচ শুরুর আগে সংবর্ধনা দেওয়া হয় স্তন ক্যানসার থেকে বেঁচে ফিরে আসা মহিলাদের।

খেলা শুরু হতেই শুরু হয় ভারতের দাপট। একের পর এক উইকেট পড়তে থাকে বাংলাদেশের। প্রথম দিনেই ১০৬ রানে গুটিয়ে যায় প্রতিবেশীর প্রথম ইনিংস। ভরা ইডেন দেখে আপ্লুত শেখ হাসিনা বললেন, ভারতের মতো শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ টেস্ট খেলতে এসেছে। এটা সাহসের ব্যাপার। দুদেশের সব ক্রিকেটারকে অভিনন্দন। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যত ক্রিকেটার এসেছেন, সবাইকে অভিনন্দন। গোলাপি বলে টেস্ট ভারতে আমরাই শুরু করলাম প্রথম। সৌরভ গাঙ্গুলি সহ বোর্ড কর্তাদের অভিনন্দন। বাংলাদেশকে সবার আগে অভিনন্দন। ওরা রাজি না হলে এই পিঙ্ক বলে টেস্ট হত না।'

ইডেনে এদিন তারকার মেলা। পিভি সিন্ধু থেকে সানিয়া মির্জা, মেরি কম, গোপীচাঁদের পাশাপাশি ছিলেন কপিল দেব, আজহারউদ্দিন, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, শ্রীকান্ত, দ্রাবিড়, শচীন—আরও অনেকে। ছিলেন মহিলা ক্রিকেটার শান্তা রঙ্গস্বামী, মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামী। চা পানের বিরতি, দিনের খেলা শেষে ছিল অনুষ্ঠান। বিশেষ আকর্ষণ ছিল রুনা লায়লার গান।

এদিন দুইদেশের প্রধানকে সংবর্ধনা দেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এককথায় প্রথম দিনের ম্যাচের নায়ক ছিলেন তিনিই।

রবিবার ম্যাচ শেষ হল মাত্র পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে। জয় পেল ভারত। গ্যালারির দিকে তাকিয়ে অভিভূত বিরাট কোহলি বলে উঠলেন, 'তৃতীয়দিন খুব তাড়াতাড়ি ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে সকলেই জানত। ভাবিনি এত দর্শক মাঠে আসবেন।' এক ইনিংস এবং ৪৬ রানে জিতে গেল ভারত।

ম্যাচ ও সিরিজের সেরা ইশান্ত। গোলাপি টেস্টে শতরান করে সেই ব্যাট সিএবি-কে উপহার দিয়ে গেলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি।

প্রসঙ্গত, ভারতে এতদিন লাল ও সাদা রঙের বল ব্যবহার করা হচ্ছিল। এই প্রথম গোলাপি বলের ব্যবহার হল।

তবে, ভারতে প্রথম হলেও ইতিমধ্যেই গোলাপি বলে ১১টি আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলা হয়ে গিয়েছে। ২০১৫ সালের ২৭ নভেম্বর অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে প্রথম গোলাপি বলে টেস্ট ম্যাচ হয়। সেই খেলায় জয়লাভ করে অস্ট্রেলিয়া। তিন উইকেটে।

# বিশেষ ক্রোড়পত্র

# ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর দ্বিশতজন্মবর্ষের প্রাক্কালে একগুচ্ছ প্রবন্ধ নিয়ে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হল। এই বিভাগে তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এক ঝলক ধারণা দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

# প্রাক্-কথন

বাংলার সমাজকে একটা চাকাওয়ালা গাড়ির ওপর তুলে তিনি ঠেলে দিয়েছেন। গাড়িটা চলছে আজও তরতরিয়ে।

স্থবির বঙ্গসমাজকে প্রগতির চাকাওয়ালা গাড়ি করে এগিয়ে নিয়ে যেতে দরকার ছিল প্রবল শক্তি। সেই শক্তি নিয়ে এসেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর জীবনব্যাপী কাজ অজস্র ডালপালায় ছড়িয়ে পড়েছে আজ, সেই বটবৃক্ষের মতো, যার আসল কাণ্ডটা অজস্র ঝুড়ির মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রতিটিই আসল বলে মনে হয়।

তাঁর মতো সংস্কৃত পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব ছিল বাংলা ভাষার ব্যাকরণের যথাযথ পুনর্গঠনের কাজ। মাতৃভাষায় সংস্কৃত পড়ানোর কথা বললেন তিনি। সংস্কৃত পণ্ডিতরা যে বাংলা ভাষাকে অচ্ছুৎ করে রেখেছিল সেই ভাষাকে তিনি তাঁর দু'হাতের মধ্যে তুলেনিলেন। নিজের মাতৃভাষাকে যেভাবে গ্রহণ করলেন তিনি, তাও নবজাগরণের আরেকটি দিকের সূচনা করল সবার অলক্ষ্যে। এতো দেশ-মায়ের পুজো। মাতৃভাষাই 'মা' হয়ে উঠল। মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাও শিখতে হবে নয়তো পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা যাবে না। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে নয়, সংস্কৃত কলেজেই তিনি চালু করলেন ইংরেজি ভাষায় অংক শেখার পাঠ। পাশ্চাত্য দর্শনও পড়তে হবে। সুযোগ বুঝে তা বাস্তবে রূপও দিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ইংরেজি ভাষা শেখার মাধ্যমেই বাংলা প্রকৃত অর্থে জ্ঞানপীঠ হয়ে উঠবে। তাই তিনি জোরালোভাবে দাবি জানিয়েছিলেন ইংরেজি ভাষার শিক্ষার পক্ষে, ছাত্রাবস্থা থেকেই।

বাংলায় শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি নারী সমাজের সংস্কারের কাজে তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন। নারীর উন্নতি ছাড়া সম্ভব নয় সত্যিকারের প্রগতি। শিক্ষার আলো পেলেই নারী নতুন জীবন পাবে—একথা তিনি বুঝেছিলেন। আজীবন এই কাজেই যুক্ত ছিলেন।

১৮২০-র ২৬ সেপ্টেম্বর এই পৃথিবীতে ঈশ্বরচন্দ্রের নেমে আসা। ২০১৯-র ২৬ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মবর্ষের দু'শো বছরের সূচনা হচ্ছে। প্রাক্-দ্বিশতজন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ-র বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হল। বিভিন্ন নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে নানা বিদ্যাসাগরের একখানি ছবি। বিদ্যাসাগর বাংলার আকাশ বাতাস মথিত করে চিরকালীন হয়ে আছেন। তবু বিশেষভাবে তাঁর জন্য এইসময় আমাদের হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠছে। এ যেন আরেক জাগরণ। আরেক ধরনের জাগরণ। এই নতুন করে প্রবুদ্ধ হওয়ার সদিচ্ছা আরও প্রবল হোক। এই সদিচ্ছাই তাঁর প্রতি আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা।

# বাংলার দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সভ্যতাকে মুছে ফেলা যাবে না: মুখ্যমন্ত্রী

বীরসিংহে মুখ্যমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। বক্তব্য রাখছেন সভামঞ্চে

করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর। রসসাগর বিদ্যাসাগর। ভাষাসাগর বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর এবং বাংলা প্রায় সমার্থক। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০ তম জন্মবার্ষিকীর সূচনা হল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, মেদিনীপুরে বীরসিংহের সিংহশিশুর জন্মভিটেয়, ঘাটালে। ২৪ সেপ্টেম্বর সেখানে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যাসাগরের বাংলার দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য বা সভ্যতাকে কখনই মুছে ফেলা যাবে না। আমাদের সংস্কৃতির মহামানব ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মস্থানে এসে আমি ধন্য। মনে হল যেন, বাংলার সংস্কৃতির আঁতুড়ঘরে আসতে পেরেছি। আমরা ধন্য হয়েছি। এসে মনে হচ্ছে যেন, সবটাই চোখের সামনে জীবনের আলোর হাতছানি। তিনি যেন বলছেন, আমাকে স্মরণ কর। বিদ্যাকে ভালবেসো। জাগরণকে ভালবেসো। বাংলার ঘরে ঘরে বারবার ফিরে ফিরে এসো।

ঘাটালে বিদ্যাসাগর মিউজিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা — বিদ্যাসাগর কলেজকে হেরিটেজ কলেজ করা হবে এবং একটি আর্কাইভ হবে • সংস্কৃত কলেজে নতুন আর্কাইভ হবে • বিদ্যাসাগরের কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়ির মিউজিয়ামটি নতুন করে তৈরি হবে • বিদ্যাসাগরের মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত ভগবতী দেবী স্কুল হেরিটেজ করা হবে • রাজ্যের সব কলেজে বিদ্যাসাগরের ওপর সেমিনার করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অর্থ দেওয়া হবে • অর্থ ব্যয় করে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির সংরক্ষণ করা হবে • বীরসিংহ গ্রামে এডুকেশন টুরিস্ট হাব হবে • বিদ্যাসাগরের নামে আকাদেমি ও গবেষণা কেন্দ্র তৈরি হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন বলেন, বাংলার মাটি সোনার চেয়েও পবিত্র। আমরা সব ভাষাকেই মর্যাদা দিই। কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুলতে পারব না। বিদ্যাসাগর মহাশয় একদিকে ব্যাকরণ, অন্যদিকে সাহিত্য, একদিকে ন্যায়-তর্ক, অন্যদিকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সব কিছুতেই পারদর্শী ছিলেন। বাংলা ভাষাতেও তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

# বাংলার ঈশ্বর

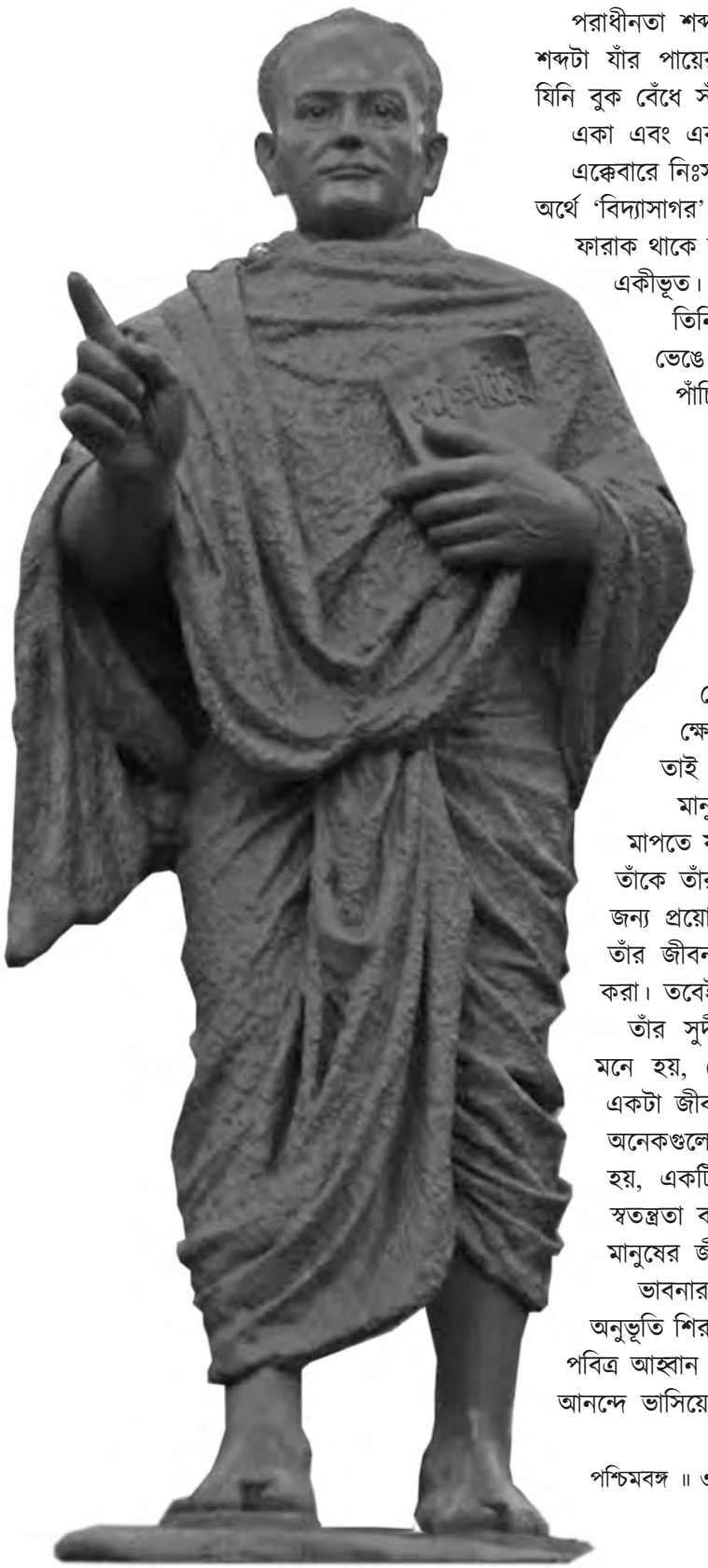

পরাধীনতা শব্দটাকে যিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারেন, দারিদ্র্য শব্দটা যাঁর পায়ের তলে লুটিয়ে থাকে, দুঃখের দামোদর পার হন যিনি বুক বেঁধে সাঁতরে—তিনি তো অনন্য। এক কথায়, তুলনারহিত। একা এবং একা।

এক্কেবারে নিঃসঙ্গ। হতেই হবে। অবধারিতভাবে। তিনিই তো প্রকৃত অর্থে 'বিদ্যাসাগর'। অর্জিত উপাধি হয়ে যায় নাম। হয়ে যায় পদবী। ফারাক থাকে না উপাধি, নাম আর পদবীতে। তিনি এক, একাকার, একীভূত।

তিনি হয়ে উঠেন পারাপারহীন সাগর। তাঁর উত্তাল ঢেউয়ে ভেঙে যায় সমাজের উপকূল, ভেঙে যায় সংস্কারের বেড়া/পাঁচিল। সব ছাপিয়ে জেগে থাকে এক হিমালয়-মানব।

যিনি বিদ্যার সাগর, তিনি বিদ্যার রঙে প্রতিটি জীবনকে রাঙিয়ে তোলার ব্রত নেবেন—এটাই তো অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য। 'বিদ্যাসাগর' উপাধির সার্থকতা এখানেই।

তিনি প্রকৃত অর্থেই বিদ্যাসাগর। বিদ্যার ফলেই তিনি পেয়েছিলেন সেই দৃষ্টি যে দৃষ্টিতে তিনি বুঝতে পারতেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তা কোনটি। জাতির, সমাজের, ব্যক্তির—যারই বা যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। আর তাই তিনি যা ছুঁয়েছেন তাই হয়ে উঠেছে সোনা। এক আশ্চর্য পরশপাথর তিনি।

মানুষ সম্পর্কে কোনও সংজ্ঞা বা ধারণা দিয়ে তাঁকে মাপতে যাওয়া, বর্ণনা বা বিশ্লেষণ করতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তাঁকে তাঁর মতো করে দেখতে চাওয়ার জন্য, বুঝতে চাওয়ার জন্য প্রয়োজন তাঁরই ধ্যান করা। অনুক্ষণ তাঁরই চিন্তা করা। তাঁর জীবন এবং জীবনব্যাপী কাজকে অন্তহীনভাবে অনুধাবন করা। তবেই সম্ভব এই স্বর্গীয় জীবনের সৌরভের ঘ্রাণ নেওয়া।

তাঁর সুদীর্ঘ জীবন অসংখ্য সফল পর্বে ভাগ হয়ে আছে। মনে হয়, যেন একটি জীবন নয়, অনেকগুলো জীবন নিয়ে একটা জীবন তিনি কাটিয়ে গিয়েছেন। যেন একটি মানুষ নন, অনেকগুলো মানুষ হয়ে তাঁর একটি মানুষে বেঁচে থাকা। মনে হয়, একটি প্রতিষ্ঠান নয়, অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শাখা হয়ে এক মানুষের জীবন হয়ে ওঠা।

ভাবনার পারদ ক্রমউচ্চতায় উদ্দীপিত হয়। রোমহর্ষক এক অনুভূতি শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায়। মহৎ জীবনের মধ্যে প্রবেশের পবিত্র আহ্বান পাওয়ার প্রগলভ্‌তা এই ক্ষুদ্র জীবনকে যেন অমলিন আনন্দে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বড়ো মধুর মনে হয় এই উপলব্ধি।

নাম তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র। গ্রামের নাম বীরসিংহ, বাবা ঠাকুরদাস, মা ভগবতী। নামগুলোর অর্থ, ব্যঞ্জনা একটু ভাবিয়ে তোলে বইকি। একজন ঠাকুরের দাস। আরেকজন স্বয়ং ভগবতী। তাঁরাই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন ঈশ্বর রূপ চাঁদকে। আর তিনিই যেন হয়ে ওঠেন বীরসিংহ।

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই জয়ী হন এই বীর। তাঁর বীরত্বের ধ্বজা দুশো বছর পরেও সমানভাবেই উড্ডীয়মান। এই বীরসিংহের পায়ের তলায় মাথা অবনত করেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বারে বারে। শ্রদ্ধায়, নম্রতায়।

তাঁকে বাংলার বাইরে যেতে হয়নি। দেশ-বিদেশ ছুটতে হয়নি ডিগ্রি আনতে। বরং ঘটেছে উল্টোটা। দেশ-বিদেশের মানুষ এসেছেন তাঁর কাছে। তাঁর বিদ্যার দান গ্রহণ করতে।

আমরা জানতাম, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে। আমরা জানলাম, যিনি প্রকৃত বিদ্বান হন, তিনি নিজ গৃহেই পূজা পান। তাঁকে কোথাও যেতে হয় না। এইভাবেই তিনি আমাদের অনেক প্রবাদ, প্রবচন, শাস্ত্র, সংস্কারের তথাকথিত তাৎপর্য ও অর্থবহতা পাল্টে দিয়েছেন বার বার।

আর এইভাবেই দুশো বছর ধরে বাঙালিকে গড়ে গড়ে ভাঙছেন আর ভেঙে ভেঙে গড়ে চলেছেন বিদ্যাসাগর। প্রায় দুশো বছর আগে এই বাংলায় বীরসিংহ গ্রামেই একটি মাত্র শিশু জন্মায়নি। কিন্তু কেবল তাঁরই কথা কেন চারদিকে। আজও তিনি আমাদের নেতা। আমাদের Friend, Philosopher and guide। আমাদের পথপ্রদর্শক।

কোন্ পথ দেখাবেন তিনি? কাকে দেখাবেন পথ? কিসের পথ? 'পথপ্রদর্শক' শব্দটা শুনতে ভালো লাগে, উচ্চারণ করতেও। নিজেকে বেশ শিক্ষিত, পরিশীলিত বলে দাবিও করা যায় এসব শব্দের উচ্চারণের মাধ্যমে। বড়ো বড়ো মনীষীদের সম্পর্কে খুব সহজে শব্দটা প্রযুক্তও হয়ে যায়। কিন্তু উপরের প্রশ্ন তিনটে আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না।

টগবগিয়ে এগিয়ে যাওয়া বাংলার ঝকঝকে তরুণ সমাজ সেই হেঁটো ধুতি পরা 'বিদ্যাসাগর মশাই'-কে পথপ্রদর্শক হিসেবে ভাববে কেন? চটাস চটাস করে চটি পরে চলেছেন টিকিধারী পণ্ডিত। যে ড্রেস-কোড আজও আদ্যপান্ত 'বিদ্যেসাগরী' তাঁকে নিয়ে ভাববার আছে টা কি?

জল পড়ে পাতা নড়ে-র দিন আজ শেষ। প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে হয়তো এই সুরেলা ধ্বনি শোনা যায়।

শহরও তো আধুনিক হচ্ছে। বিদ্যালয়ের ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। শিশুর স্কুলের নাম প্লে-স্কুল। সকাল থেকে বিকেল গড়িয়ে যায়। স্কুল থেকে খাবার দেয়। ঘুমেরও ক্লাস হয়। এরই মাঝে পড়া পড়া খেলা বা খেলা খেলা পড়া। শিশু নাকি এভাবেই ভালো করে গড়ে উঠবে, মানুষ হবে।

বিকেল থেকে সন্ধে কারো বা আবার ক্রেশে কাটে। মা-বাবারা কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে শিশুকে নিয়ে যাবে। বই-পত্রও স্কুলেই থেকে যায় কখনও বা। পিঠে বইয়ের অত বোঝা নেওয়া শিশুর নাকি ঠিক নয়।

প্রায় দুশো বছর আগে এই বাংলায় বীরসিংহ গ্রামেই একটি মাত্র শিশু জন্মায়নি। কিন্তু কেবল তাঁরই কথা কেন চারদিকে। আজও তিনি আমাদের নেতা। আমাদের Friend, Philosopher and guide। আমাদের পথপ্রদর্শক।

একেবারে ঠিক কথা। ১০০ শতাংশ ঠিক। তবু গলার শিরা ফুলিয়ে আমরা বলব—'বিদ্যাসাগর আজও আমাদের পথপ্রদর্শক।' 'আমরা মানে কারা?' কোন্ বয়সের তাঁরা? ভুল পথে চলতে চলতে, গোত্তা খেতে খেতে যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে অকাজের বস্তু হয়ে উঠেছি, তখনও কি 'বিদ্যাসাগর আমাদের পথপ্রদর্শক' হতে পারেন?

মেরুদণ্ড শক্ত হবে কী করে? বিদ্যাসাগরের মতো। প্রশ্ন তো ওঠেই। বাড়ি কেবল রাত-ঘুমের জায়গা। এসি-ঘরের বন্ধ জানলা দিয়ে যে শিশু বৃষ্টির জল পড়তে দেখেনি, গাছের পাতা নড়তে দেখেনি, সে বিদ্যাসাগরকে চিনবে কী করে?

চিনবে না। জানবে না। বুঝবে না। ইট-রঙা 'বর্ণপরিচয়' হাতে নিলে কত মজা লাগে সে কোনও দিন জানতে পারল না। হাজার হাজার বাংলার শিশু জীবনের বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হল না।

এদের জীবনের পথপ্রদর্শক বিদ্যাসাগর? ঘরের চৌকাঠ এ-পাড় ও-পাড় করতে করতে, এক্কা দোক্কা খেলতে খেলতে শিশুর মনে গুনগুনাত—জল পড়ে পাতা নড়ে.....।

দিন বদলেছে। ঘুমের মধ্যে শিশু বলে চলে—

Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water
Jack fell down and broke his crown
and jill came tumbling after

জল নয়, বলে water-এর কথা। অ, আ নয়। শিশু হাতে খড়ি দেয় A, B, C, D দিয়ে। হায় বিদ্যাসাগর!

আমরা অনেকেই হয়তো শোকে মরতে বসছি আর বলছি, বাংলা ভাষাটাই তো শিখছে না আজকালকার বাচ্চারা। যাচ্ছে নার্সারি বা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। বর্ণপরিচয় তো ছুঁয়েই দেখেনি, বিদ্যাসাগরের নামই শোনেনি।

শুধু ইংরেজি নয়, হিন্দি কালচারও ওরা রপ্ত করছে ছোটো থেকেই। হিন্দি কার্টুন দেখে দেখে হিন্দিটাই তো বলে বেশি। বাঙালিয়ানা আর থাকল না।

পঞ্চাশোর্ধ্ব বাঙালি ভুরু কপালে তুলে পা নাচাতে লেগে গেছে। একেই তো টুকরো হতে হতে বাংলাটা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর বাঙালিয়ানার এই হাল। পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়ায়, কথা-বার্তায়, চাল-চলনে বোঝাই যায় না বাঙালি কিনা।

একেবারে ঠিক কথা। ১০০ শতাংশ ঠিক। তবু গলার শিরা ফুলিয়ে আমরা বলব—'বিদ্যাসাগর আজও আমাদের পথপ্রদর্শক।' 'আমরা মানে কারা?' কোন্ বয়সের তাঁরা? ভুল পথে চলতে চলতে, গোত্তা খেতে খেতে যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে অকাজের বস্তু হয়ে উঠেছি, তখনও কি 'বিদ্যাসাগর আমাদের পথপ্রদর্শক' হতে পারেন?

পারেন, পারেন এবং পারেন। বিদ্যাসাগর যে কোনো বয়সের, যে কোনো সময়ের, যে কোনো সমাজের পথ-প্রদর্শক। তাই দুশো বছরেও তিনি সমান জীবন্ত।

চিরকাল একদল মানুষ সমাজদেহের বিশুদ্ধ রক্তের সাবলীল প্রবাহকে আটকে রাখার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে এইভাবে তাদের বীরত্ব প্রকাশের, ক্ষমতা প্রদর্শনর। সমাজকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার নিজেরাই নিজেদের হাতে তুলে নেয়। দাবি করে, সমাজকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদেরই। এই রক্ষাকর্তাদের দাপট ও ক্ষমতা দেখাবার জায়গা হয়ে ওঠে নারী এবং দুর্বল শ্রেণি। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে এই রক্ষাকর্তাদের

ক্ষমতা প্রদর্শন চরম অন্যায়ের রূপ নেয়। এখানে হিন্দু ধর্মে উচ্চবর্ণের মানুষদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। নিম্নবর্ণের মানুষদের সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হত না। বাংলায় মুসলমান শাসকেরা একের পর এক রাজত্ব করতে থাকে। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা ক্রমশ রক্ষণশীল হয়ে ওঠে। নারীর স্থান হয় অন্তঃপুরে। তৈরি হতে থাকে বিধি-নিষেধের বেড়া। খুব অল্প বয়সেই কন্যাসন্তানকে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু হয়। যে কোনও বয়সের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়াটা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। পুরুষের বহুবিবাহ করা ছিল স্বীকৃত প্রথা। এইসব নানা কারণে অল্প বয়সে বিধবা হওয়ার অসংখ্য ঘটনা ঘটত। এই বিধবাদের দুর্দশা ছিল সীমাহীন।

এরই মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, অনেক সময় এইসব বিধবা মহিলারা স্বামীর অনেক সম্পত্তির মালিক হতেন। অর্থাৎ সম্পদশালী বিধবা মহিলার সংখ্যাও সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

নানা নিয়মের মধ্যে বাঁধা ছিল অল্পবয়সী বিধবা মেয়েটি। সাদা শাড়ি, আতপ চাল ও নিরামিষ খাবার, একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা সহ আরও কত না নিয়ম পালনে যখন তার জীবন অতীষ্ঠ, তারই মধ্যে তার অগাধ সম্পদের মালিকানা। এর চেয়ে করুণ পরিহাস আর কি হতে পারে!

একদিকে তার টগবগানো কৈশোর অথবা ফুটন্ত যৌবন, বাধ-না-মানা শরীর-মনের ঢেউ, তার উপর সম্পত্তির ভাগীদার হওয়া। পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের তো মাথায় হাত!

যদি সে আবার তার সব ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে অন্যত্র চলে যায়! যৌথ পারিবারিক প্রথায় সম্পত্তির মালিকানাও যৌথ। যৌথ সম্পত্তির ভাগ হওয়া কঠিন এবং পদ্ধতিও জটিল। তবু ভাগ তো হতই। অল্পবয়সী নিঃসন্তান বিধবার সম্পত্তি ভাগ হওয়া ছিল রীতিমতো ভয়জনক ব্যাপার। তখন মুসলিম শাসকদের প্রাধান্য চলছে। মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত। হিন্দু সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা থাকলেও বিধবা মহিলাকে বিয়ে করার রেওয়াজ ছিল না।

তাহলে বিধবা নিঃসন্তান মেয়েটি অত ধনসম্পত্তি নিয়ে কি করবে? সমাজের কাছে সে এক জ্বলন্ত সমস্যা। একদল মানুষ এর সহজ সমাধান খুঁজলেন। জ্বলন্ত সমস্যাকে জ্বলতে দেওয়া ঠিক নয়। জল ঢালো। নিভিয়ে দাও। কীভাবে নেভাবে? তাদের উর্বর মস্তিষ্ক সমাধান খুঁজে পেল। আগুন দিয়ে আগুন নেভাও।

স্বামীর চিতায় তাকে জ্বলন্ত পুড়িয়ে মারো। না, ঠিক এভাবে নয়, এত সহজ সত্য তারা উচ্চারণ করত না। একটা সুন্দর মোড়ক তৈরি করল। আজকের দিন হলে বলতাম একে আমরা প্রোজেক্ট বা প্রকল্প। প্রকল্পের নাম হত—সতীদাহ প্রকল্প।

মেয়েদের জন্ম থেকেই শেখানো হত—পতীর পুণ্যে সতীর পুণ্য। পতির চিতায় একই সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে মরলে সে 'সতী' হবে—এর চেয়ে বড়ো পাওনা আর কি?

আর একটু তলিয়ে ভাবলে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, সতীত্ব নাশের প্রভূত সম্ভাবনা কি তৎকালীন সমাজে ছিল? সেই কারণেই কি সতীত্ব বজায় রাখতে মহিলারা কিছুটা বা স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতায় পুড়ে মরতে দ্বিধা করত না।

একদিকে তার টগবগানো কৈশোর অথবা ফুটন্ত যৌবন, বাধ-না-মানা শরীর-মনের ঢেউ, তার উপর সম্পত্তির ভাগীদার হওয়া। পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের তো মাথায় হাত!

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটা রাজপথ তৈরি হচ্ছিল। সেই পথেই আজ যে শেষ মাইলস্টোনটা পোঁতা হয়েছে সেখানেই বড়ো বড়ো করে লেখা আছে — ছেলে, মেয়ে সমান সমান।

সতীদাহের ঘটনা বাংলায় কম ঘটেনি। সারা বাংলা জুড়েই সতীদাহ প্রথা রমরমিয়ে চলত। অর্থাৎ মেয়েরা এই গল্প শুনতে শুনতে, দেখতে দেখতেই বড়ো হচ্ছে। তারা জানছে, স্বামীই জীবনের সব। স্বামী না থাকলে বেঁচে থাকা অর্থহীন। না খেয়ে সুখ। না পড়ে সুখ। না কেঁদে সুখ।

মেয়েদের জীবন ছিল একান্তভাবেই স্বামী-নির্ভর। প্রকৃত অর্থে, পুরুষনির্ভর। শৈশবে পিতা, যৌবনে ও প্রৌঢ়ত্বে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্র। আর নারীর স্ত্রী হিসাবে ভূমিকা ছিল কিরকম সেকথা বুঝে নিতে পারি সেই অতিশ্রুত বাক্যটি থেকে—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। অর্থাৎ পুত্রের জন্য স্ত্রী প্রয়োজন। পুত্র প্রয়োজন কেন? বংশরক্ষার জন্য। বংশরক্ষা কেন? মানবপ্রবাহ বজায় রাখার জন্য।

সুতরাং স্ত্রীর প্রয়োজন বলেই নারীর প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেত। তাই নারীর বা কন্যার প্রধান বিষয় ছিল 'স্ত্রী' হয়ে ওঠা। আজ যে 'কন্যা' কাল সে 'স্ত্রী' হবে, পরশু 'মা' হবে। ভূমিকার পরিবর্তনই ছিল নারীর জীবনের একমাত্র নিয়তি।

সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার আশ্চর্য ক্ষমতাই স্ত্রী-লিঙ্গের সমস্ত প্রাণীকে বিশেষ দায়বদ্ধতা দিয়ে পৃথিবীতে পাঠায়। মনুষ্য জগতের ক্ষেত্রে সভ্যতার অগ্রসরতার জন্য স্ত্রী-লিঙ্গের মানুষের দায় ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তেমনি তার নিজের প্রতিও দায় বেড়েছে।

পুরুষ লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে স্ত্রী-লিঙ্গের মানুষের ফারাক কমানোর একটা দায় উপলব্ধি করেন কিছু উন্নত চিন্তার মানুষ। আজ একে আমরা 'লিঙ্গ বৈষম্য' শব্দ বন্ধনীতে ধরে ফেলেছি।

অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনও রকম বৈষম্য করা ঠিক নয় বলে মনে করা হয়। তাই বলা হয়—ছেলে, মেয়ে সমান সমান।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের হাত ধরে বাংলায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটা রাজপথ তৈরি হচ্ছিল। সেই পথেই আজ যে শেষ মাইলস্টোনটা পোঁতা হয়েছে, সেখানেই বড়ো বড়ো করে লেখা আছে—ছেলে, মেয়ে সমান সমান।

সুদূর বীরসিংহ থেকে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট্ট ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন পড়াশুনা শেখাবেন বলে। তাঁর কোনও মেয়েকে আনার কথা ভাবতে পারেননি। আজ যখন প্রমাণিত ছেলে, মেয়ে সমান সমান, তখন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের বাংলার সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা দেখতে পাব, সমাজে ও পরিবারে 'কন্যাসন্তান'-এর অবস্থান কেমন ছিল।

পরাশর সংহিতায় 'বিধবা বিবাহ' শাস্ত্রসম্মত হওয়া সত্ত্বেও যারা সমাজে এর বিরুদ্ধ মত প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই মেকি সমাজরক্ষকদের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর জয়ী হয়েছিলেন। এই জয় 'মানবতার জয়'। এই জয়কে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের জয়-পরাজয়ের আলোচ্য বিষয় করে তোলার মধ্যে এক ধরনের অবরুদ্ধ চেতনার প্রকাশ ঘটানো হয় মাত্র।

কতজন 'বিধবা'-র বিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এই সংখ্যা নির্ণয় করার মধ্যে কোনও মহত্ব নেই। যদি শুধুমাত্র একজন 'বিধবা'-রও বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, সেটাই বা কম বড়ো কথা নাকি!

বিধবা মহিলারা বিয়ে করতে পারে এবং সেটা হিন্দু শাস্ত্রসম্মত—এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি। বিদেশি শাসকদের দিয়ে আইনও করিয়েছিলেন। তাঁর সার্থকতা এইখানেই।

সেই সময় মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য একদল মানুষ যখন উদ্যোগ নিচ্ছেন, আরেক দল মানুষ বোঝাচ্ছেন—লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে। বিধবা হওয়াই যে নারীর সর্বশেষ নিয়তি নয়, আবারও যে নতুন জীবন শুরু করতে পারে—এই কথাটাই জোরালোভাবে শক্তি জোগাল নারীকে। মেয়েরা ভেতরে ভেতরে বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগল।

'সতী' হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা দুটোই বন্ধ হয়েছে। বিধবারা আবার বিয়ে করছে। মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। পরপর ঘটনাগুলোকে সাজালে দেখা যাবে, বাংলার মানুষের জীবন আলোয় ঝলমল করছে। নতুন সূর্যালোকে জেগে উঠেছে বাংলা।

এই জাগরণের সুফল আমরা পেয়েছি। সেই সময় থেকে আজও বাংলায় মেয়েদের সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীর উন্নয়ন না হলে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকবে। নারীশক্তির প্রতিষ্ঠাই বাংলার শক্তির মূল কথা। শক্তিসাধনার পীঠস্থান বাংলার 'শ্রী' কার্যতঃ প্রকাশিত নারীর মাধ্যমে।

বিদ্যাসাগর এই মহান কাজের সূচনা করেছিলেন। সমাজের প্রকৃত রক্ষাকর্তা ছিলেন তিনি। আজ আমরা সেকথা উপলব্ধি করতে পারছি। বাংলার ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নারীকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

'জীবনের সবচেয়ে নৈতিক উৎকর্ষসম্পন্ন কাজ' বলে যেটাকে বিদ্যাসাগর উল্লেখ করেছেন সেটা হল হিন্দু বিধবার পুনরায় বিয়ে দেওয়ার বিষয়টি আইন সিদ্ধ করা। ১৮৫০ সালে প্রথম তাঁর লেখনি উদ্যত হল বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে। ১৮৫৫ সালে বিধবা-বিবাহের আইনি স্বীকৃতির জন্য দুটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। বিধবার পুনর্বিবাহের আইনি স্বীকৃতির জন্য ৯৮৭ জন মানুষের সই সহ আবেদন জমা দিলেন ভারত সরকারের কাছে।

রাজা রাধাকান্ত দেব-এর নেতৃত্বে ৩৬,৭৬৩ জন মানুষের সই সহ বিরোধীপক্ষও আবেদন জানালো এর বিরুদ্ধে, ভারত সরকারেরই কাছে। উল্লেখ্য, বাংলা ছাড়াও, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকেও সই সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু বিধবা-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হল ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই। বিদ্যাসাগর সফল হলেন।

এবার একটু বিরোধীপক্ষের নেতার কথা বলা যাক। তিনি রাজা রাধাকান্ত দেব। সেই ১৮২০ খ্রিস্টাব্দ। বীরসিংহে জন্মালেন বাংলার ঈশ্বর। সেই ১৮২০-এর শিক্ষা বিষয়ক এক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, ওই বছরের পাঠশালার পরীক্ষায় গরিব পরিবারের ৪০টি মেয়ে পরীক্ষা দিয়ে অনেকরকম 'পারিতোষিক' পেয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ১৮২০-র আগে থেকেই মেয়েদের পড়াশুনা শেখানো হচ্ছে। ফল সন্তোষজনক হওয়াতে কর্তৃপক্ষ শোভাবাজার, শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটিলিতে 'বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করে রাজা রাধাকান্তদেব 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি মহিলা শিক্ষাসমিতির হাতে তুলে দেন।

এই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন—

*অতএব তাহাদিগকে যেমন গৃহকার্যাদি শিক্ষা করান তেমন বাল্যকালে যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎ বিদ্যা শিক্ষা করান উচিৎ হয়।....আর*

'সতী' হওয়ার সুযোগ ও সম্ভাবনা দুটোই বন্ধ হয়েছে। বিধবারা আবার বিয়ে করছে। মেয়েরা বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। পরপর ঘটনাগুলোকে সাজালে দেখা যাবে, বাংলার মানুষের জীবন আলোয় ঝলমল করছে। নতুন সূর্যালোকে জেগে উঠেছে বাংলা।

বাংলার নারীদের শিক্ষার জগতে নিয়ে আসার জন্য বেথুনের আত্মোৎসর্গ যেন চিরকালের জন্য করুণরসে আঁকা হয়ে আছে। এই মহৎ কাজে বেথুন-বিদ্যাসাগর জুটি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সেকথা লেখা দরকার। দু'জনেই ছিলেন সমমনোভাবাপন্ন এবং উৎসর্গীত কর্মী। যেন দুই স্তম্ভ।

বেথুন সাহেব

*দ্বিতীয়ত কোন শ্রুতি ও স্মৃতিতে স্ত্রীলোককে বিদ্যাভ্যাস করিতে নিষেধ বচন লিখেন নাই। নীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্ত্রীলোককে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক, ইহাতে স্ত্রীলোককে পাঠ করান অবশ্যকর্তব্য হয়।....এখন সকলের উচিত হয় যে আপন আপন পরিজনের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কোন বিদ্যাবতী স্ত্রীকে অনাইয়া বাটীতে রাখিয়া তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করান এবং যাহারা নির্ধন তাহাদিগকে অনুমতি দিয়া যাবৎ বয়ঃস্থা না হয় তাবৎকাল পাঠশালায় পাঠান।*

তিন-চার বছর ধরে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় কোনো রকমে চললেও অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ওই ১৮২০-তেই নারী-শিক্ষার প্রকৃত নেতা জন্মালেন।

১৮৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন, বড় লাটের দরবারের ব্যবস্থা সচিব এবং শিক্ষা সমিতির সর্বাধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বেথুনের আলাপ জমে উঠল।

শুরু হল বেথুন প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক ও সংগঠক হিসাবে কাজের দায়িত্ব নেওয়া। এটিই পরে 'বেথুন স্কুল' নামে পরিচিত হয়। এটি বেথুন ও বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় নারীশিক্ষার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে।

বাংলার নারীদের শিক্ষার জগতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বেথুনের আত্মোৎসর্গ যেন চিরকালের জন্য করুণরসে আঁকা হয়ে আছে। এই মহৎ কাজে বেথুন-বিদ্যাসাগর জুটি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সেকথা লেখা দরকার। দু'জনেই ছিলেন সমমনোভাবাপন্ন এবং উৎসর্গীত কর্মী। যেন দুই স্তম্ভ।

এছাড়াও এগিয়ে এসেছিলেন রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। তাঁরা নিজেদের মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠালেন সমাজের বাধানিষেধ তোয়াক্কা না করে। ফলে, অনেক বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা পাঁচিল গড়ে তুললেন যে পাঁচিলের ভিতরে থেকে মহানন্দে কাজ করে গেলেন বেথুন-বিদ্যাসাগর জুটি।

বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য টাকা-পয়সা সংগৃহীত হল এই দুই ব্যক্তির প্রচেষ্টায় ও অন্যদের সহযোগিতায়। বেথুন নিজে অনেক টাকা দান করেন এই উদ্দেশ্যে। প্রথমে বিনা বেতনে এবং পরে অল্প বেতন নিয়ে মেয়েদের পড়ানো হত। শিক্ষকদের বেতনের অর্থও অনেকটাই বেথুন নিজে বহন করতেন। মেয়েদের গাড়ি করে বাড়ি থেকে আনানো হত। এই ব্যয়ের প্রায় অনেকটাই বেথুনকে দিতে হত।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে এখানে পাঠালেন। শুরু হল বালিকা বিদ্যালয়। এই বালিকাদের সঙ্গে বেথুনের হৃদয় জড়িয়ে গেল। তাদের জন্য শুধু খেলনা কিনেই আনতেন না তিনি। তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে উঠতেন।

বিদ্যাভূষণ প্রণীত 'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবনচরিত' থেকে জানতে পারি—

*'তিনি প্রায়ই স্বভবন গমনকালে ভুবনমালা ও কুন্দমালাকে উভয় কক্ষে ধারণ করিয়া স্বীয়াবাসে লইয়া যাইতেন। তাহাদের বালিকাসুলভ*

*জুগুপ্সিত অত্যাচার সকল তিনি আহ্লাদপূর্বক সহ্য করিতেন। ভুবনমালা ও কুন্দমালা বেথুনের এতদূর স্নেহভাজন হওয়াতে লেডী ড্যালহাউসি প্রভৃতিও তাহাদিগকে যথেষ্ট ভালোবাসিতেন।'*

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকাল। গঙ্গার ওপারে জনাই গ্রামে সেখানকার বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের অনুরোধে সেখানে বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান বেথুন। অনেক কাদামাখা পথে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পায়ে হেঁটে যেতে হয় তাঁকে। দুরারোগ্য জ্বরে আক্রান্ত হলেন। পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিলেন অকালে। বিদ্যাসাগর হাপুস নয়নে কাঁদলেন। ধীরে ধীরে শোক ভুলে, অহরহ মনে বেথুনের উপস্থিতি অনুভব করতে করতে তাঁর অসমাপ্ত কাজ করে যেতে লাগলেন। সঙ্গে পেলেন আরও অনেক সুহৃদ।

নারীশিক্ষার এই কাণ্ডারী বেথুন-স্মৃতি নিয়েই সারাজীবন বেঁচে ছিলেন। তিরোধানের মাত্র কয়েকবছর আগে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে একদিন বেথুন স্কুলে আসতে হয়। সকলের সঙ্গে কথাবার্তার পর সকলের জন্যই তিনি জলযোগের ব্যবস্থা করেন। এমনকি শিক্ষিকা, ছাত্রী, পুরোনো দাসীর জলযোগের ব্যবস্থা করে নজর পড়ে ৩/৪ জন শিক্ষকদের উপর। পালকির বেহারাদের জন্য রাখা একটি টাকা ছিল। সেটিও তিনি তাঁদের হাতে দিয়ে বলেন, 'এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে, তোমরাও এই যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিও, বাদ যাওয়া বিধেয় নহে'।

স্কুলের দালানে বেথুন সাহেবের পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে চলেন। কেবল কেঁদেই চলেন বিদ্যাসাগর। বাড়ি ফিরলেন। মনের আকাশ ছেয়ে জলভরা মেঘ। নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর-এর জীবনী-তে লিখছেন সেদিনকার কথা। তাঁর মুখে বিষাদের ছায়া দেখে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বারবার তাঁর কাছে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় জানতে চাইলেন এর কারণ। প্রথমে ভাবলেন, নিশ্চয়ই শরীর ভালো নেই। বৃদ্ধ বিদ্যাসাগর বললেন যে বেথুন স্কুলে গিয়ে সব দেখে শুনে তাঁর বড় সুখ হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়, মুখে তো সুখের কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে আরও চিন্তিত হলেন। সুখের মধ্যে কেন এত দুঃখ, এত বেদনা তা তো বোঝা যাচ্ছে না। ধীরে ধীরে বিষাদের জলভরা মেঘ ভাঙতে লাগল। বিদ্যাসাগর বলে চলছেন—*'এতগুলি মেয়ে লেখা-পড়া শিখিতেছে, তারাই আবার সেই স্কুলে শিক্ষায়ত্রীর কার্য করিতেছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ইহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিল, সে দেখিল না। নিজের পদমর্যাদা ভুলিয়া যে ব্যক্তি বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিত, আর নিজে ঘোড়া হইয়া, হামাদিয়া, বালিকাদিগকে পিঠে তুলিয়া ঘোড়ায় চড়াইত, যাহার পিঠের উপর বালিকারা বসিয়া খেলা করিত সে দেখিল না।'*—কথা চলছে। চোখ বেয়ে জল পড়ছে। নিজের কাপড় দিয়ে জল মুছছেন। থেমে যাওয়া কথা বলছেন। আবার জল পড়ছে।

এই হৃদয় যাঁর তিনিই তো হতে পারেন একাধিক সাগরের মিলনকেন্দ্র। বাংলার ঈশ্বরচন্দ্র আমাদের কাছে মহাসাগরসম।

**–সুপ্রিয়া রায়**

স্কুলের দালানে বেথুন সাহেবের পাথরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে চলেন। কেবল কেঁদেই চলেন। বাড়ি ফিরলেন। মনের আকাশ ছেয়ে জলভরা মেঘ। নিজেকে সামলাতে পারছেন না।

# দ্বিগুণজীবিত পৌরুষ

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

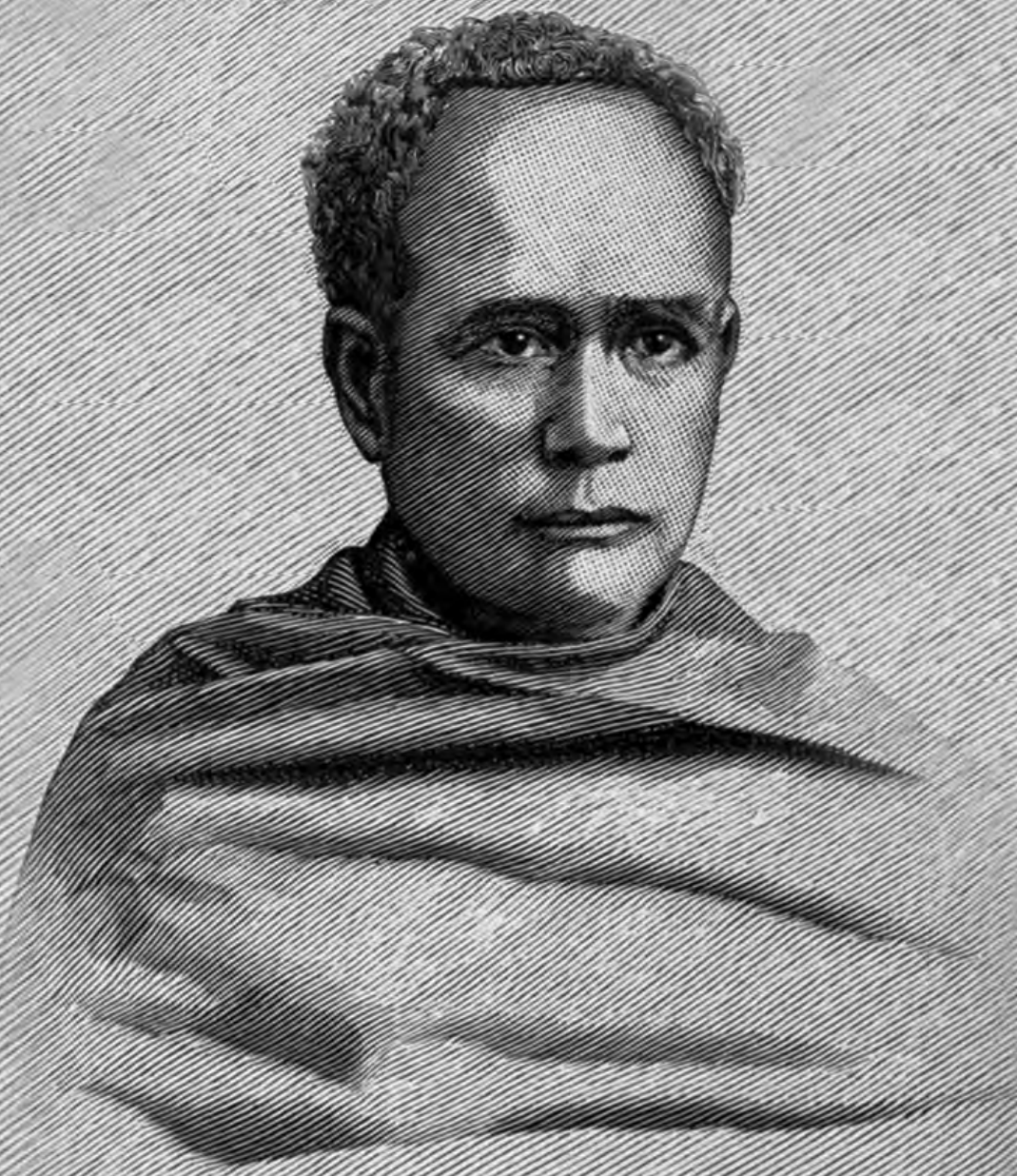

## এক: বিশ্বাসসুন্দর জীবন

বড়ো গাছ। গোটাকতক সেকেলে অশ্বত্থগাছ। ভালো ফুল। লাল ফুল। নানান আম। লতানে আম। জামতাড়া আর মধুপুর স্টেশনের মাঝে। কার্মাটাঁড়ে স্টেশন লাগোয়া বাগান-জমি। সাদা বাড়ি। মাইল দেড়েক আলপথে সাঁওতাল গ্রামে দ্রুত হাঁটছেন। হাতে বাটি। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে চলেছেন। সাঁওতাল ছেলেটার চিকিৎসা করতে। রাতভোরে 'কথামালা' কি 'বোধোদয়ে'র প্রুফ দেখেছেন। কাটছেন, বদল করছেন শব্দ। বুড়ো বয়সেও বাংলার ইডিয়াম নিয়ে খুঁতখুঁতুনি। সালটা ১৮৭৮।

বাইরের বড়ো ঘরের দেওয়াল-তাক। সার সার। ভরে উঠছে অনেক ভুট্টায়। আরো ভুট্টায়। ভুট্টায়।

—'ও বিদ্যেসাগর, আমার পাঁচ গণ্ডা পয়সা; নইলে ছেলেটার চিকিৎসা হবে না; ভুট্টাকটা তুই রাখ।'

আর এক সাঁওতাল। বাজরা ভরা ভুট্টায়।

—'আমার আটগণ্ডা পয়সার দরকার।'

তিনি ভুট্টা কিনছেন। তাকে তুলছেন।

তাক ভর্তি হচ্ছে। উপচে উঠছে।

বাইরের উঠোন, জমির কাছটাতে। সাঁওতালের দল। ছড়িয়ে। গোল গোল। বসা।

—'ও বিদ্যেসাগর আমাদের খেতে দে'—

পরিবেষণ করছেন ভুট্টা। ভরা উঠোন। ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি। কোথাও দলে পাঁচ। আট। আবার দলে দলে। মাঝখানে শুকনো পাতা।

মাইল দেড়েক আলপথে সাঁওতাল গ্রামে দ্রুত হাঁটছেন। হাতে বাটি। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে চলেছেন। সাঁওতাল ছেলেটার চিকিৎসা করতে।

মনুষ্যত্বের অভিমুখে দৃঢ়নিষ্ঠ সুশৃঙ্খল বিদ্যাসাগর। প্রকৃতি, মানুষ, ভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবান তিনিই। গভীর আত্মসম্মানবোধে যাঁর প্রতিষ্ঠা।

ছোটো ছোটো কাঠ। আগুন ধরে কাঠে। পাতায়। ভুট্টা সেঁকে খায়। ভারি ফুর্তি। আনন্দ-জীবন!

সরলতা, সবলময় রসিক জীবনের মাঝে, আজ, তিনি। চলে এসেছেন মেকি কথার ছল-চাতুরি মোড়া সেই সভ্য জীবন ছেড়ে। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের ডাকে। স্বাধীনতার নিজস্ব বাণীকে স্পর্শ করতে প্রাণে প্রাণ মেলাতে।.....

বিশ্বাসসুন্দর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবন তাঁর। ঋজুতার প্রখর একাগ্র বৈপ্লবিক একক জীবনের প্রায় উপান্তে। ১৮৮৯ সালে। চিঠি লিখবেন। প্রতিবাদের চিঠি। তাঁর বসতগ্রামে, সাবেক অশ্বত্থগাছ কেটে ফেলতে উদ্যত হয়েছে কিছু অমানুষ। প্রতিবাদে কঠোর হয়েছিল ললাট। ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে দুর্বৃত্ত কর্মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলছেন— 'পিতামহী প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষটি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।...অশ্বত্থ রক্ষায় মোকদ্দমা সমাধা করিবে। পরে আমি ওই টাকা তোমাকে দিব।'

১২৯৮ সালের ৩ বৈশাখ শম্ভুচন্দ্রকে 'পিতামহী ঠাকুরানির অশ্বত্থ বৃক্ষের মোকদ্দমা আর দানখরচ—পাঁচশত টাকা পাঠাচ্ছেন।' বৈশাখ মাসে। বৈশাখের কবি হয়তো তাই খুব ধরতে পেরেছিলেন তাঁকে। বলাই, বালা মেঝেন, ভারত থেকে বিশ্বদর্শন তিনি যে জানতেন। গুণীকে গুণের দ্বারাই বুঝতে হবে। মনুষ্যত্বের অভিমুখে দৃঢ়নিষ্ঠ সুশৃঙ্খল বিদ্যাসাগর। প্রকৃতি, মানুষ, ভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবান তিনিই। গভীর আত্মসম্মানবোধে যাঁর প্রতিষ্ঠা। 'সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরা যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত সেইখানে স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত অজানার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।' বিদ্যাসাগরচরিত বোঝা ছিল, হৃদয় দিয়ে।

এই মহৎ চরিত্রের অনন্যতন্ত্রতার অনুসন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। জানতেন প্রথম বর্ণপরিচয়ে। প্রথম রবির আভাসে। '৩য় পাঠের। কথা কয়। জল পড়ে। মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে।' কী সেই আশ্চর্য ছন্দ! যেমন লিখতে, বলতে। মনের ছবিতে। আর শুনতে। ভাষা গঠনের শিল্পপ্রতিভা আর সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয়ে আশ্চর্য হবেন অনেক পরে। লিখবেন সেকথা অভিভাষণে। এমারেল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে। ১৩০২ সালের ১৩ শ্রাবণে। অপরাহ্ণে।

**দুই: জল পড়ে পাতা নড়ে**

রূপকথার অরূপরাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আগে। ছ-সাত বছরের রবীন্দ্রনাথ। তারপর অক্ষর পরিচয়। বর্ণপরিচয় দিয়েই, 'কর খল'। বানানের তুফান পেরিয়ে যে দিন মিলেছিল আপন পাওয়ায়, 'জল পড়ে পাতা নড়ে' সেদিন আগামী কবির পরিচয় ঘটে আদিকবির প্রথম কবিতায়। এতবড় অব্যর্থ সহজ সরল সুরযোগ পৃথিবীতে আর কোথাও ঘটেছে কিনা জানি না।

তবে জানি। শিশুকালে যে সব বই পড়েছিলেন, তার মধ্যে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়'-এর কথা বৃদ্ধবয়সেও মনে ছিল তাঁর। আকাশের যে-নীলটা দেখা যায়, সেটা যে কোনো বাধাই নয়। জানত অমল, জানতেন তিনি। জানিয়েছিলেন 'Chamber's Rudiment of knowledge'-এর অনুবাদক। বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী, তিনিই। বিদ্যাসাগর।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মাঝখানটাতে তাঁর আসা। উপান্তের বছর— ১৮৩৩ আর ১৮৯১। ১৮৬১-র অর্থময়তা সেদিন আলোয় কবিপ্রবরের অভিজ্ঞানে ভরপুর। বৈশাখে তিনি চিরনবীনতার শাখায় ডালে-পালায়।

আকাশে বাতাসে। পূর্ণ আনন্দে ভরপুর। সে বছরেই তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য থেকে আরও সুসংহত 'verse form' 'মেঘনাদবধ কাব্য' এল নবজাগরণে। মাইকেলের হাত ধরে। ১৮৬১-র ফাল্গুনের বিকেল। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা। রুপোর Claret jug পুরস্কার তুলে দেওয়া হল মহাকবির প্রতিভার সম্মানে। ১৮৬২, বীরাঙ্গনা কাব্য। উৎসর্গ করলেন—"Heroic Epistles from the most noted Puranic Women to their lovers of lords'—to Vidyasagar." ১৮৬২ থেকে ১৮৬৭ মাইকেলের জীবন, পাশ্চাত্যে, উথাল-পাথাল। ঢেউ আর ঢেউ। ভার্সাই থেকে বারে বারে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন বিপদে। পেয়েওছেন ওই করুণাসাগরের কাছ থেকেই। করুণ চিঠির লেখনী আশ্চর্য প্রতিভায় ভরপুর। বিশ্লেষণে। মহত্বের বিচারে। মূল্যায়নে। 'Nature's noblemen'। করুণার সাগর তুমি। তোমার আছে '..the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother!'

ভার্সাই থেকে বারে বারে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন বিপদে। পেয়েওছেন ওই করুণাসাগরের কাছ থেকেই। করুণ চিঠির লেখনী আশ্চর্য প্রতিভায় ভরপুর।

মধুকবির হৃদয়ের অনুভব। সুবৃহৎ সরলতায়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। করুণাসাগরের দয়াময় মূর্তি স্বচক্ষে জেনেছিলেন।

'অভিলাষ' কবিতা তত্ত্ববোধিনীতে বিনা নামে কে যেন লিখল। সেই বালক একদিন ভবিষ্যতের প্রজ্ঞাবান সরল সুন্দর আনন্দলোকের রচয়িতা হবেন। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণ মাস। মনে জাগে নানা আশা, আকাঙ্ক্ষা। কবির বিচিত্র সাধ।

রবি চলেছেন *ম্যাকবেথ* তর্জমা হাতে। সঙ্গে রামসর্বস্ব পণ্ডিত। চলেছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। *ম্যাকবেথ* তর্জমা কিছু অংশে 'ভারতী'-তে ছাপা হয়েছিল। এবারও বিনা নামে। বিদ্যাসাগরের চোখে পড়েছিল।

রবি চলেছেন। বিদ্যাসাগরে। রামসর্বস্ব পণ্ডিত সঙ্গে। 'পুস্তকে ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে ঢুকিতে আমার বুক দুরু দুরু করিতেছিল; তাঁহার মুখচ্ছবি দেখিয়া যে আমার সাহস বৃদ্ধি হইল, তাহা বলিতে পারি না। ইহার পূর্বে বিদ্যাসাগরের মতো শ্রোতা আমি তো পাই নাই; অতএব এখন হইতে খ্যাতি পাইবার লোভটা মনের মধ্যে খুব প্রবল হইল। বোধকরি কিছু উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়াছিলাম।'

অনুবাদ সাহিত্য বিদেশি সাহিত্যের সম্ভার এনে দিয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', যার আবির্ভাব ১৮৪৩ সালে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ শুরু করেন, বিদ্যাসাগর, এই পত্রিকারই পাতায়।

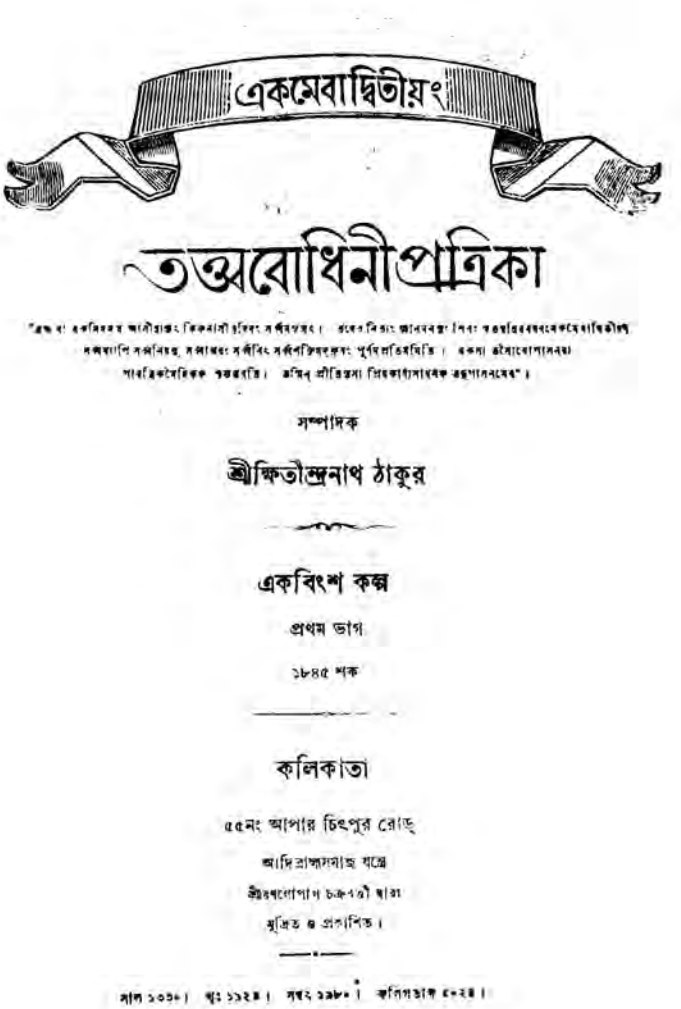
একমেবাদ্বিতীয়ং

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একবিংশ কল্প

প্রথম ভাগ

১৮৪৫ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীহরলোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এমন সময়ে বিদ্যাসাগর সেখানে এসে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত হাতের বই নিয়ে বলছেন বিদ্যাসাগরকে। বরাবরের মতো সে বিদ্যালয় ছেড়ে চলেছে। এখানে তার আর পড়া হবে না। নিজের ঘরে নিয়ে চলেছেন ভবিষ্যতের যথার্থ বীরকে, বীরসিংহ স্বয়ং।

**তিন: বহুমুখী মানসচেতনা**

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে তেজস্বিতার দীক্ষালাভ করেছিলেন। বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরেরই জীবন থেকে। ওদিকে জোড়াসাঁকো ওপাশে সিমুলিয়া। এদিকে মেট্রোপলিটন স্কুল। সুকিয়া স্ট্রিটে। আটবছরের নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭১ সালে বিদ্যাসাগর-এর মেট্রোপলিটিন ইনস্টিটিউশনের নবম শ্রেণিতে (এখনকার দ্বিতীয় শ্রেণি) ভর্তি হলেন। তখন প্রধান শিক্ষক প্রসন্নচন্দ্র রায়।

একদিন ক্লাসে সে এক প্রলয় কাণ্ড! একজন শিক্ষক রেগেমেগে একটা ছাত্রকে অন্যায়ভাবে বেদম প্রহার করছেন। কিম্ভূত সব মুখভঙ্গি করছেন। অকারণ উন্মত্ততা। নরেন হেসে ফেলেছিল। এই দেখে মাস্টার নরেনকে চড় চাপড়। অবিরাম দুহাতে কান মলা। কান ধরে শূন্যে তুলে বেঞ্চির ওপর দাঁড় করালেন। রক্তারক্তি কাণ্ড। ক্রোধে নরেন্দ্রনাথ দত্ত বলছেন, 'আমার কান মলবেন না। আমাকে মারবার আপনি কে? আমার গায়ে হাত দেবেন না—'

এমন সময়ে বিদ্যাসাগর সেখানে এসে পড়লেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত হাতের বই নিয়ে বলছেন বিদ্যাসাগরকে। বরাবরের মতো সে বিদ্যালয় ছেড়ে চলেছে। এখানে তার আর পড়া হবে না। নিজের ঘরে নিয়ে চলেছেন ভবিষ্যতের যথার্থ বীরকে, বীরসিংহ স্বয়ং। বোঝালেন, সান্ত্বনা দিলেন। অনুসন্ধানে, আদেশ জারি হল। বিদ্যালয়ে ওই ধরনের শাস্তি দেওয়া আর চলবে না।

ভাবার কথা, মানবিকতা চিন্তায় প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ, একদিন বিদ্যাসাগরের হৃদয়, শক্তি, পৌরুষ আর মানবিকতার পূর্ণ বিকাশে উদ্বুদ্ধ হয়ে বলবেন নিবেদিতাকে 'ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে।'

**মেট্রোপলিটন স্কুল** **ছবি: সৌরভ দত্ত**

বহুমুখী মানসচেতনা উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল—চিন্তা ভাবনার প্রয়োগশিল্প। করে দেখানোর আত্মাশক্তিতে গৌরব-আলোকে ভরপুর। যুক্তিবাদ, মৈত্রীভাবনা, মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, স্বাদেশিকতা। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিচার-প্রসূত শ্রদ্ধা, ইতিহাসচেতনা, বিজ্ঞান-চেতনা, শিল্পসংস্কৃতি বোধ, সাংস্কৃতিক অনুবর্তনের রূপে রূপ নিয়েছিল রবীন্দ্রনাথে, বিবেকানন্দে। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ডিরোজিও আরো সব বলবানের ইতিহাসে সমৃদ্ধ নতুন আলোকের ছটায়। চিন্তা-ভাবনা ও কাজের বিস্ফোরণে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়ে। বিশ্ববীক্ষায়। যার প্রাসঙ্গিকতা ক্রমাগত যুদ্ধ দাঙ্গা-বিধ্বস্ত, পরিবেশ বিপর্যস্ত, ন্যুব্জ হয়ে পড়া অমানবিক আর কাপুরুষের সময়ের ইতিহাসে, অবাক কাণ্ডই মনে হতে পারে।

অবাক হয়েছিলেন সেদিন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনেরই পারিতোষিক বিতরণ সভায়। বক্তা, ছাত্র—নরেন্দ্রনাথ সর্বোত্তম হবেন। বক্তা হিসাবে কী কণ্ঠে কী বিষয়ে আর উপস্থাপনায়। বিদ্যাসাগরের স্কুলে শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ, ইংরেজিতে বক্তৃতা করছেন। আর সভাপতি বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৭৬ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। সেদিনই ভবিষ্যত কথা গড়ে উঠেছিল—নরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের মতনই তাঁকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করেছেন। একগুঁয়েমির মধ্যে শিল্প আছে। আছে দার্শনিক মেজাজ। শিশুর সারল্য ও একাগ্রতা। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানবিক সমাজভাবনা। যা দুজনের রেনেসাঁ-প্রয়োগ ভাবনায় জেগে উঠেছিল। এ পৃথিবীর সীমারেখাহীন মানবের আতিথ্যচর্যার কাজে।

রহস্যচ্ছলে মনে পড়তেই পারে, নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটনে বিএল পড়েছেন কিছুদিন। বিএ পাশ দিয়ে। আর হ্যাঁ, শিক্ষকতা করেছেন, মাত্র কয়েক মাস। চাকরিও খুইয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরমশাইয়ের জামাতা, সূর্যকুমারের সুপারিশে। নরেন্দ্রনাথ সুকিয়া স্ট্রিটের ইনস্টিটিউশনের শিক্ষক ছিলেন মাত্র কিছুদিন। সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের চাঁপাতলায় মেট্রোপলিটনের প্রধান শিক্ষকও ছিলেন বেশ কিছুটা সময়। জুন ১৮৮৬।

কিছুকাল কখনো কখনো হতে পারে দীর্ঘসূত্রতার কর্মময়তার সূত্রকথাও। বিবেকানন্দ, আত্মবিশ্বাসের যে উদ্বোধন রচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগরের আজীবন সংগ্রাম আদর্শে তা ধরা ছিল। মেলা ছিল। জীবনযাপন সংস্কৃতির পরতে পরতে। এ কি কখনো ভুলতে পারেন? নবজাগরণের পূর্ণ-পরিণাম জোড়াসাঁকো-সিমলের যুগলবন্দি। বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়বে।

বাংলার নবজাগরণের দ্বিতীয় পুরুষের অনুভবের গভীরতা; অদম্য, একাগ্র কাজ করার শক্তি। হৃদয়বত্তা। পরার্থপরতা। অন্যায়ের বিপক্ষে রুখে দাঁড়ানোর আত্মশক্তি। জীবন ধর্ম। নির্ভীকতা। অতীতকে শ্রদ্ধা করে বর্তমানে প্রয়োগ করা। আর, পৃথিবীর যত কিছু ভালো নিয়ে নতুন বিশ্বনীড়ের ভাবনা। ছুঁৎমার্গ অতিক্রম করে নেতি নেতি ভাবনাকে দূরে সরিয়ে সদর্থক জীবনযাপন শিল্প—এমন জীবন সংস্কৃতির আদর্শে দু-জন যুগনায়কের ভোর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কথায়-কাজে সত্য আচরণের রশ্মিতে, আদর্শে ভরপুর বিদ্যাসাগরি আলোয়।

একগুঁয়েমির মধ্যে শিল্প আছে। আছে দার্শনিক মেজাজ। শিশুর সারল্য ও একাগ্রতা। ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানবিক সমাজভাবনা। যা দুজনের রেনেসাঁ-প্রয়োগ ভাবনায় জেগে উঠেছিল। এ পৃথিবীর সীমারেখাহীন মানবের আতিথ্যচর্যার কাজে।

হৃদয় দিয়ে নদী থেকে নদী, ঘাট থেকে মাঠে দেখেছেন, ঘুরেছেন। সে কেবল নিছক কাব্যসংগীতমালা সাজানো নয়। বড় প্রস্তুতি চলেছে মনে মনে। মানব-কল্যাণ সংকল্পের আর পল্লি পুনর্গঠনের ভাবনা-চিন্তা 'ছিন্নপত্রে'ই আছে।

**চার: অতিথি ও বিদ্যাসাগর চরিত**

১৮৮১। *ভারতী* প্রায় পাঁচ বছর চলছে। এ ধরনের কাজে একটা সাহিত্যসংসদ দরকার। লেখা, বলা, কওয়া এক জোটে যদি হয়। তাহলে বেশ হয়। যুবক রবির এই ইচ্ছে। কলকাতা সারস্বত সম্মিলন গড়বেন, অ্যাকাডেমি ধাঁচে। হ্যাঁ, রবি গেলেন তাঁরই কাছে। বিদ্যাসাগর বললেন, ''বেশ, ভালো, কিন্তু দেখ হোমরা-চোমরাদের কাছে যেয়ো না কাজ পণ্ড হবে।'' রবি কি তখন জানতেন প্রজ্ঞাবানের কথায় ধরা পড়ল 'আমিটাই' হয়ে পড়ল সব—এই সংক্রামক ব্যাধির উত্তর-ইতিবৃত্ত!'' সেদিন তিনি শোনেননি। জোড়াসাঁকোয় হোমরাচোমরাদের সভা বসল। সংবিধান হল। মিটিং হল। কথার ফুলঝুরি উঠল। (এখনো যেমন হয় আর কি!) রাজেন্দ্রলাল মিত্র সভাপতি। কেশব সেনের ভাই কৃষ্ণবিহারী আর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক। কত লোকের ভিড়। মাথাওয়ালাদের আস্ফালন! বিদ্যাসাগর এলেন না! মিটিংসর্বস্ব অ্যাকাডেমি গেল ভেঙে। কাজ হল না। রবীন্দ্রনাথ দোরে দোরে ঘুরে সারা হলেন।

কাজ করতে গিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, বিদ্যাসাগরের কথাই ঠিক।

অভিজ্ঞতা দিয়ে সেদিন বুঝেছিলেন বলেই কি বিশ শতকের ভোরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি মোড়া আত্মশক্তিকে সঙ্গী করে, একলাই পাঁচটি ছাত্র নিয়ে, রুক্ষ খোয়াই মাঝে আমগাছের তলায়। মাটির বেদিতে। বিদ্যালয় গড়বেন। বিশ্ববিদ্যাচর্চার আশ্রম। কিছুকাল আগেই তো তাঁর মেট্রোপলিটনের আর এক ছাত্র—পদব্রজে সুখী দুখী আনন্দযজ্ঞের ভারতকে নিজে দেখবেন। যাচাই করবেন। মানবকল্যাণের কাজে জীবন সমর্পণ করতে। জীবনদানের মধ্যে যে গরিমা, গৌরব ও সাধনা—সে মূর্তি তাঁরা দুজনেই দুপথে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেহ মন ও আত্মায় ভরপুর বিদ্যা আর করুণাভরা সুধাসাগরের নিশ্চিত স্মৃতি ছিল জেগে।

*সাহিত্য* পত্রিকায় 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' লিখলেন বিদ্যাসাগর। ভাষা, বিষয় ও বিন্যাসে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের লেখাটি নিয়ে আলোচনা করলেন। *সাধনা* পত্রিকায়।

*'সাধনা'* পর্বের শেষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 'অতিথি' এবং 'বিদ্যাসাগরচরিত'। ১৮৯৫, শ্রাবণ মাস। কবি তখন শিলাইদহে। মানুষ-ভূমি-প্রকৃতি-পরিবেশ মাঝে। প্রত্যক্ষ করেছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্বন্ধ। অভিজ্ঞতায়, অনুভবে বুঝলেন দেশের, গ্রামের বৃহত্তর মানুষ কী নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র-অনাহার আর অস্বাস্থ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়ে চলেছে। হৃদয় দিয়ে নদী থেকে নদী, ঘাট থেকে মাঠে দেখেছেন, ঘুরেছেন। সে কেবল নিছক কাব্যসংগীতমালা সাজানো নয়। বড় প্রস্তুতি চলেছে মনে মনে। মানব-কল্যাণ সংকল্পের আর পল্লি পুনর্গঠনের ভাবনা-চিন্তা 'ছিন্নপত্রে'ই আছে। রয়েছে জীবনগান রচনায়। মানবের আতিথ্য সংগীতে, কবিতায়, গল্পে। কিছুকাল পরে এক চিঠিতে বলবেন পল্লি পুনর্গঠনের কাজটা আমার মাথায় ঝোঁকের মতো চেপে বসেছে। এ থেকে আমার নিস্তার নেই। নিস্তার পেতেও চাননি। পতিসর থেকে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন কর্মসাধনা। জীবনবিচ্যুত লোকদেখানি নামকেনার পর্ব নিশ্চয়ই ছিল না। তাই যথার্থ যোগ্য হয়ে উঠছিলেন, বিদ্যাসাগর চরিত বিচারে-বিশ্লেষণে। ব্যক্ত হয়েছিল যেন মনের কোণের নানান অভিপ্রায়। এত বড়ো জীবনের ভাবকে নিজের মতন প্রয়োগ করে দেখা। স্পষ্টবাদী, যথার্থবাদী ব্যক্তিত্বকে অভিজ্ঞতার আলোকে আলোচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

## পাঁচ: মননজীবনের অধিকারী, বীরশ্রেষ্ঠ

'করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার' মনুষ্যত্বের অভিমুখে দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন বিরল ভাষায়। বিদ্যাসাগরের জীবনীর বিস্তৃতিতে প্রবেশ করেছেন; তুলে এনেছেন আশ্চর্য সব উপাদান। ইতিহাসকে সবল ভাষ্যে প্রয়োগ করলেন। বিরল বিশ্লেষণে খোঁজ করেছেন, পারিবারিক ঐতিহ্য পরম্পরায়। পিতামহ, পিতা ও মাতার মধ্যে বুঝতে চেয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষের মহত্ত্বের উপকরণ। মনুষ্যত্বের আদর্শরূপ খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের পরিবারেরই মধ্যে; জীবন আচরণে। বিদ্যাসাগর হঠাৎ যে হননি, হয়ও না, সেদিকে আমাদের চোখ ও মন নিয়ে গেছেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বল ও সাহস আলোচনায় এনেছেন ঈশ্বরচন্দ্র চারিত্রক দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধকে বুঝতে, বোঝাতে। রামজয়ের হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব অনুধাবন করতে পারলে, তাঁদের উত্তরপুরুষকে নিবিড়ভাবে জানা যায়। অনবদ্য ভাব আর শৈলীতে বিদ্যাসাগরকে উপস্থাপিত করেছেন। অনেকটাই জীবনী অবলম্বনে, প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে। এ ধরনের চারিত্রপূজা আজও বিরল। দেখি, বিদ্যাসাগরের মায়ের ছবিকে আশ্চর্য কুশলতায় পর্যালোচনা করেছেন। একজন বিশেষজ্ঞ Potrait Artist-এর মতন। ভগবতী দেবীর অসামান্যতা স্পষ্ট করেছেন, লিথোগ্রাফপটে ওই দেবীমূর্তি সামনে রেখে। ''ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংহত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থসাধনের জন্যে কেন বিদ্যাসাগরকে, এই মাতৃদেবী ব্যতীত, কোনো পৌরাণিক দেবীপ্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।'' দয়াবৃত্তির অসাধারণত্ব যার প্রকাশ বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখতে পাই, তার সচল বীজ ও আদর্শ তাঁর মায়ের মধ্যেই যে ছিল, সে কথা জীবন-আলোচনায় নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক। জননীর চরিতে, তাঁর পরিবারের ঐতিহ্যে এবং পুত্রের চরিতে ও আচরণে প্রভেদ নেই। এই বিষয়টিকে বিশেষ স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন বিস্তারে ও অনুবীক্ষণে জীবন আলোচনা, সেই সময়ে খুব বেশি হয়নি। শ্রমসুন্দর জীবন; বাংলার রেনেসাঁর কাজ করে দেখানোর যে ইতিহাস—বিষয়টি স্পষ্ট হয় তাঁর লেখনীতে ও বিশ্লেষণে। জাতপাত অগ্রাহ্য করে, সেবাকে জীবন-আচরণে বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেছিলেন। এই আদর্শ; পরবর্তী সমাজ ইতিহাসে যে বড়ো ভূমিকা নেবে, স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন *ছিন্নপত্রাবলীর* লেখক। আর একটি বিষয়, অত্যন্ত বাস্তব এবং প্রয়োগযাগ্য, যে, কাজ করলেই শুধু হবে না, ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলা চাই। রবীন্দ্রনাথ সেদিন অভিভাষণে বলেছিলেন ''যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল।'' মননজীবনের অধিকারী তিনি, বীরশ্রেষ্ঠ। আবার শিল্পী মনেরও স্থপতি। ''চারিদিকের অসাড়তার মধ্যে এই ব্যথিত বিশাল হৃদয় কেবল নিঃসহায়ভাবে, কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে একাকী আপন কাজ করিয়া গিয়াছেন।'' কাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ, বড়ো হৃদয়ের অনন্য এই বীরের জীবন। বড়ো স্পষ্ট হয়ে যায়, মাত্র কতক পাতার, বড়ো মাপের চারিত্রপূজায়। প্রথমেই

রামজয়ের হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব অনুধাবন করতে পারলে, তাঁদের উত্তরপুরুষকে নিবিড়ভাবে জানা যায়।

ভগবতী দেবী

সেদিনের সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে, আপনার গভীর ইচ্ছার স্রোতের কাছাকাছি, স্পষ্টতায়, বলতে পেরেছিলেন, বিদ্যাসাগর সুখী ছিলেন না।

প্রতিমাদেবী

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী হিসেবে। বিদ্যাসাগর-পরবর্তী গদ্যসাহিত্য আরও ব্যাপক কলানৈপুণ্যে ভরে উঠতে লাগল। যে কাজে বিপ্লব এনেছিলেন বিদ্যাসাগর। পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথেরই কাছে আমরা গদ্যকবিতা তো পাব! সরল, সুন্দর, সুশৃঙ্খল কর্মজীবন বিদ্যাসাগর-পরবর্তী রবীন্দ্রজীবন-সংস্কৃতিতেই বিস্তৃতরূপ নিয়েছিল। এমনকি আধুনিক পরিবেশসখ্য স্থাপত্য ও নির্মিত পরিবেশ রচনায়। শান্তিনিকেতনে, ওই রূপ ও রসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আমরা পাব। যা আজও সমান সচল। প্রাণবন্ত।

এমন বিরল মনের জীবন ও মননক্রিয়া এবং সেই জীবনের আশ্চর্য স্থিতধী মনুষ্যত্ব প্রকাশের ধারাবাহিকতায় বিস্মিত রবীন্দ্রনাথ নিশ্চিত ছিলেন, বাঙালির জীবনে বিদ্যাসাগর একক। পুষ্পকোমল ও বজ্রকঠিন বক্ষের বলিষ্ঠ চরিত্র এই বাঙালিজীবনের আশ্চর্য ঘটনা। সে কথা একবাক্যে স্বীকার করেছেন। বিধবা বিবাহ নিয়ে, তাঁর সংগ্রাম। হার-না-মানা জেদ ও পুরষসিংহের আত্মশক্তি।

১৯১০ সালে ব্রাহ্মসমাজে প্রথম বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথই। প্রবল আত্মশক্তির বলে, নিজের ছেলে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ দিয়েছিলেন, বালবিধবা প্রতিমাদেবীর সঙ্গে। সেদিনের সমাজের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে, আপনার গভীর ইচ্ছার স্রোতের কাছাকাছি, স্পষ্টতায়, বলতে পেরেছিলেন, বিদ্যাসাগর সুখী ছিলেন না। 'এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।' যে মনুষ্যত্বের প্রকাশ চাইতেন চারপাশে তিনি তা পাননি। অজেয় পৌরুষ ও তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব; এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির কাছে যেন সুগভীর ধিক্কার ছিল। সর্ববিষয়েই তিনি সদর্থে বিপরীত ছিলেন।

**ছয়: '...তাঁরি পরে জানি কমলা সদয়!'**

ছিলেন বলেই শেষের হতাশাময় জীবনে সাঁওতালদের কাছে, মাটির মানুষের সহৃদয়তা, সরলতা ও সবলতায় যেন আশ্রয়লাভ করেছিলেন। কোথায় যেন মিলের সুদূর নির্জন জীবন-উপাসনা জেগে রয়।

গঙ্গার পাড় বাঁধানোর কাজ চলছে বেলুড় মঠে। ১৯০১-০২ সাল। জীবনের উপান্তে এসে মাঝি-মেঝেনদের খাওয়াচ্ছেন। পরিবেশন করছেন নিজের হাতে। কথা কইছেন, প্রাণের কথা। সহজ সরল সুন্দরের অভ্যর্থনায়। বিবেকানন্দ।

এমন আপন বন্ধুরাই তো সেদিন শান্তিনিকেতনে পিয়ারসন পল্লি থেকে এসেছিল তাঁর মাটির শ্যামলী গড়ে তুলতে। ১৯৩৫-এ। বালী মেঝেনদের দল, সাঁওতাল-সাঁওতালি মাটির বন্ধুরা, ধরিত্রীর বরপুত্রকে চোখের দেখা-মনের দেখার আশ্চর্য সবুজ রহস্য জানিয়েছিল। হাজার হাজার বছরের মাটির ভারত জেগেছিল। সত্য সুন্দর, শ্রমসুন্দর, বলিষ্ঠ জীবনসংস্কৃতিতে ভরে উঠেছিল কার্মাটাঁড়, বেলুড় কিংবা শান্তিনিকেতন। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাংস্কৃতিক অনুবর্তনে। পরীক্ষালব্ধ সত্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় মারণ ঢেউ সেদিন মনুষ্যত্বের পরাজয়কেই নিশ্চিত করে তুলছিল। বয়সের ভারে অশক্ত রবীন্দ্রনাথ, যুদ্ধের সংবাদে

বিদীর্ণ তিনি—শতকষ্ট উপেক্ষা করেও মেদিনীপুরে এলেন। ১৯৩৯। ১৬ ডিসেম্বরের প্রভাতে তাঁরই হাতে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হল। উদ্বোধন করলেন মহত্ত্বের আলো। ঘন অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবীর আকাশে একটি সবুজ রেখার আশায়। বুঝেছিলেন চরিত্র চাই, চরিত্র। নিটোল সত্য-সুন্দর জীবন আদর্শ। আকাশের নীল যে বাধা নয়। সুদূরেরই ডাক। আশার ইশারা। গৌরবেরই ডাক। ছেলেবেলায় তাঁর কাছেই তো শিখেছিল বালক রবি। সেদিন উপান্তে এসে বললেন '....বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।' *বিদ্যাসাগর চরিত* যেদিন নদীপাড়ে মানুষী গ্রামবাংলার কোলে বসে লিখবেন। সেদিন তারাপদ এসেছিল তার আতিথ্য মেলে। আকাশের মুক্তিতে সে আলো প্রত্যক্ষ করত।

'...এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।' অতিথি ও বিদ্যাসাগর চরিত যখন লিখছেন ওই শ্রাবণেই বলেছেন (১৩ শ্রাবণ ১৩০২) মঙ্গলভাবের বিদ্যাসাগর-কথা। শ্রাবণেই (৩০ শ্রাবণ ১৩০২) ইন্দিরা দেবীকে চিঠিতে (ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ২২৪) জানাবেন, এবার কর্মযজ্ঞে নামিয়া পড়ার অন্তর-কথা। '...কাজের মধ্যে পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। ...এখন আমার কাছে নতুন রাজ্য খুলে গেছে।... ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে অবজ্ঞা করে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে চলতে হয়...কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।' নগরসংগীত কবিতায়: 'সুখের দুখের চক্রমধ্যে কখনো উঠিব উধাও পদ্যে/কখনো লুটিব গভীর গদ্যে নাগর দোলায় দুলিয়া/হাতে তুলি লব বিজয়বাদ্য আমি অশান্ত আমি অবাধ্য/যাহা কিছু আছে অতি অসাধ্য তাহারে ধরিব সবলে।...'

কল্যাণশক্তিকে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করার কাজে, উদ্যোগী পুরুষসিংহের স্মৃতি নিশ্চয়ই জেগে উঠেছিল। 'তাঁরি পরে জানি কমলা সদয়!'

বাইরের উঠোনে মাটির সন্তানের দল গোল গোল বসেছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে দলে দলে। যুদ্ধে, দাঙ্গায়, দূষণ, ছায়া ও আত্মম্ভরিতার আক্রমণে, মিথ্যাচারের বন্যায়; প্লাবনে ভেসে উঠেছে পৃথিবীর মানুষ, প্রাণ-প্রকৃতি। গৃহহারা কোটি কোটি। আরও কোটি। শয়ে শয়ে কোটি। গোল গোল বসা—কার্মাটাঁড়ের উঠোনে অশ্বত্থের ছায়ায় লতানে আম গাছের তলে তলে—

'ও বিদ্যেসাগর আমাদের খেতে দে'—মিথ্যায় উপচে পড়া এ জীবনে আজ বড়ো খিদে, তেষ্টা—

মেঘ ডাকে। জল পড়ে। হাত নাড়ে।
''বিদ্যেসাগর আমাদের খেতে দে—''

১৬ ডিসেম্বরের প্রভাতে তাঁরই হাতে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দিরের দরজা উন্মুক্ত হল। উদ্বোধন করলেন মহত্ত্বের আলো। ঘন অন্ধকারে ঢাকা পৃথিবীর আকাশে একটি সবুজ রেখার আশায়। বুঝেছিলেন চরিত্র চাই, চরিত্র। নিটোল সত্য-সুন্দর জীবন আদর্শ।

সৌজন্য : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা : ১১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা

# বাংলার নবজাগৃতির প্রথম আধুনিক পুরুষ

# বিদ্যাসাগর

## স্বপন মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের পুরোধাপুরুষ পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব তাঁর প্রধান চারিত্র বৈশিষ্ট্য—এ কথা বলেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যদিও তাঁকে আমরা বিদ্যাসাগর, দয়ার সাগর, করুণাসাগর প্রভৃতি অভিধায় সম্বোধন করতেই বেশি অভ্যস্ত কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে বিদ্যাসাগরের যে আদর্শ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দীপ্যমান সেই আদর্শ এই আন্তরিক সম্বোধনে পূর্ণতা পায় না। বিদ্যাসাগর সর্বার্থে একজন আধুনিক মানুষ। তিনি স্বাধীনচেতা, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এবং স্বাতন্ত্র্যধর্মী—এই সবকয়টি গুণই আধুনিক মানুষের প্রধান পরিচয়। কাকে আমরা আধুনিক মানুষ বলি? যিনি সমাজকে, জাতিকে, দেশকে স্বসময়ের সীমা অতিক্রম করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন তিনিই একজন আধুনিক মানুষ। প্রাচীন ঐতিহ্যের শিকড় থেকে রস শোষণ করেও যিনি সমস্ত ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে পুরাতনের মালিন্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন তিনিই আধুনিক। একজন আধুনিক মানুষ স্বসময়ের অধিকাংশ মানুষের থেকে এগিয়ে থাকেন বলে তিনি স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হলে সহজেই বুঝতে পারব কী অর্থে বিদ্যাসাগর আমাদের থেকে স্বতন্ত্র। সাধারণ বাঙালির চারিত্রিক দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে শল্যচিকিৎসকের মতো রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না। যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার করিয়া পরিতৃপ্ত হই, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান; পরের চোক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তি বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।'

এই যে আমরা, সেই আমাদের ঠিক বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর যে কাজ একবার করবেন বলে মনস্থ করেছেন সেই কাজ সম্পাদন না করে কখনো সরে আসেননি, তার জন্য তাঁকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে, জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে কিন্তু পিছপা হননি। অথচ তাঁর কোনো কাজেই কোনো আড়ম্বর ছিল না। কাজ ফলপ্রসূ হবার পর তিনি নীরবে ক্ষান্ত হতেন।

সত্যকেই জীবনের একমাত্র ধর্ম বলে মনে করতেন। পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাঁকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। সে অর্থে তিনি তাঁর অগ্রজ রেনেসাঁপুরুষ রাজা রামমোহন রায় ও হেনরি ডিরোজিওর যথার্থ উত্তরসূরি। কিন্তু তিনি ডিরোজিয়ান ছিলেন না বা হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, রামগোপাল ঘোষ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারিচরণ সরকার, রাজনারায়ণ বোস—সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিদ্যাসাগরের নাম ছাত্রাবস্থায় কেউ জানত না। অথচ পরবর্তীকালে সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার কথা জানিয়ে গেছেন।

১৮৪৩ সাল। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র তেইশ বছর। দু-বছর আগে সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি-সহ সার্টিফিকেট পেয়েছেন। এই সময় চারিদিকে ইয়ং বেঙ্গলের প্রভাব। তাদের অনেকের মধ্যে অতি উগ্র ইংরেজ অনুকরণ, আরেকদিকে ধর্মান্তরের ঢেউ। ১৮৪৩-এ মাইকেল খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সে-বছরই ডিসেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু তাতে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের বন্ধুত্বের সুহৃদ সম্পর্ক নষ্ট হল না।

অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করলেন না কিন্তু সকালবেলা মা-কালীর মূর্তিতে প্রণাম না করে তাঁকে বলতেন—Good Morning Mam.

এমন সামাজিক ও ধর্মীয় ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আপন লক্ষ্যে অটল ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি সংস্কৃত কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র। সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, পুরাণ সমস্ত বিষয়েই ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্যুতি দেশ-বিদেশে খ্যাতিলাভ করে কিন্তু বিদ্যার মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দিগ্‌বিরোধে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। ১৮২৯ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে পরের বছর অর্থাৎ ১৮৩০ থেকেই ইংরেজি শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার জন্য ১৮৩৫ সালে যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ আসে তখন ১৫ বছরের বালক সহপাঠীদের নিয়ে যৌথভাবে আবেদন জানান যাতে ইংরেজি তুলে দেওয়া না হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় দর্শনের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী দর্শনও পাঠ করা প্রয়োজন আর সেই জন্যই তিনি ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন। যখন হিন্দু কলেজে তাঁর সহাধ্যায়ীরা বেনথাম, লক্, হিউম, রুশো, ভলত্যের, টমাস পেইন পড়ছেন তখন তাঁদের পাঠের সঙ্গে তিনি সংযোগ রেখে চলতেন। তার ফলে দেখা যায় যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞান- মনস্কতায় বিদ্যাসাগর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন না বরং হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। জন্মসূত্রে ব্রিটিশ-মার্কিন রাজনৈতিক দার্শনিক টমাস পেইন তাঁর ১৭৭৬ সালের বিখ্যাত ইস্তেহার Common Sense প্রকাশ করেন। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ Common Sense-এর অসাধারণ রাজনৈতিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের ভাবনার মধ্যে যে মুক্তচিন্তার প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাতে প্রমাণিত হয় কেবল ভারতীয় দর্শন বা ন্যায় শাস্ত্র নয় তাঁর মধ্যে টমাস পেইনের প্রভাব স্পষ্ট। আলেকজান্ডার ডাফের শিষ্য রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফোক্ টেলস্ অব্ বেঙ্গলের রচয়িতা রেভারেন্ড লালবিহারী দে ছিলেন

সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার জন্য ১৮৩৫ সালে যখন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নির্দেশ আসে তখন ১৫ বছরের বালক সহপাঠীদের নিয়ে যৌথভাবে আবেদন জানান যাতে ইংরেজি তুলে দেওয়া না হয়।

বিদ্যাসাগর সেখানেই স্পষ্ট করে বললেন, বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন ভ্রান্ত। তবু তা পড়ানো হয়। তাই ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অবশ্যই জানতে হবে নতুন নতুন জ্ঞানচর্চার ফসল।

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এঁরা ধর্মান্তরিত হওয়ায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কে কোনো প্রভাব পড়েনি। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ষড়দর্শন রচনার জন্য সর্বদাই বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হতেন। দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরকে এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে তাঁর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভার অর্পণ করেন এবং শেষে বিদ্যাসাগর হন এই পত্রিকার সম্পাদক।

দৃঢ়চেতা বিদ্যাসাগরের বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিনির্ভর চিন্তার প্রভাব পড়ে তাঁর শিক্ষক জীবনে। সরকারি সংস্কৃত কলেজে তিনি যে প্রশাসনিক পরিবর্তন ঘটান তাতে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থায় হাজার বছরের অন্ধকার অনেকটাই কেটে যায়।

১৮৫৩ সালের মাঝামাঝি কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জে. আর. ব্যালেনটাইন কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের আমন্ত্রণে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে কাউন্সিলকে একটি রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেন যে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধ্যক্ষতায় একই সঙ্গে হিন্দু শাস্ত্র এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে। এর ফলে ছাত্রদের মনে হতে পারে 'সত্য' বোধ হয় দু-রকম। তাই ইউরোপীয় বিজ্ঞানের কেবল সেই অংশটুকুই পড়ানো হোক যা ভারতীয় শাস্ত্রকেও মান্যতা দেয়। বিদ্যাসাগর বেঁকে বসেন। তিনি বলেন ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অভ্রান্ত যুক্তিগুলিও ছাত্রদের জানতে হবে, তা ভারতীয় শাস্ত্র মানুক বা না-মানুক। তিনি আরো বললেন যে ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে এমন অনেক গোঁড়া ব্যক্তি আছেন যাঁরা মনে করেন শাস্ত্র কোনো মানুষের লেখা নয়, দেববাণী। তাই অভ্রান্ত; তাই তাঁরা অন্য কোনো যুক্তি মানতেই রাজি নন। ভারতীয় ছাত্রদের কেবল সেই সব ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান জানার সুযোগ দেওয়া হোক যেগুলোকে ভারতীয় শাস্ত্র মেনে নিয়েছে—এর অর্থ আলেকজান্দ্রিয়ার সেই বিখ্যাত গ্রন্থাগারের লক্ষ লক্ষ বই পুড়িয়ে দেওয়ার যুক্তির সমতুল্য। খলিফা ওমর বলেছিলেন:

"If these writings of the Greeks agree with the book of God, they are useless and need not be preserved; if they disagree they are pernicious and ought to be destroyed."

যদি ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেটুকু ভারতীয় শাস্ত্র মেনে নিয়েছে সেটুকু ছাত্রদের জানানো হয় তবে তো তার জানার আর দরকার নেই কারণ সেটা তো ভারতীয় শাস্ত্রেই আছে। আর যা ভারতীয় শাস্ত্রে মান্যতা পায়নি তা না জানতে দেওয়া মানে তো সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়ারই সমান। তাই ভারতীয় শাস্ত্রও পড়তে হবে আবার নতুন নতুন ইউরোপীয় যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানের কথাও পড়তে হবে। কোনোটাই বাদ দেওয়া ঠিক হবে না। বিদ্যাসাগর সেখানেই স্পষ্ট করে বললেন, বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শন ভ্রান্ত। তবু তা পড়ানো হয়। তাই ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে অবশ্যই জানতে হবে নতুন নতুন জ্ঞানচর্চার ফসল। আমাদের দেশজ পণ্ডিতগণ যখন দেখেন ইউরোপীয় কোনো বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তখন তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে এমন কথাই গর্বের সঙ্গে বলতে থাকেন যে ভারতীয় শাস্ত্র একেবারেই অভ্রান্ত এবং সেই সঙ্গে তাঁরা আধুনিক যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানকে তাচ্ছিল্য করতে থাকেন।[১]

বিদ্যাসাগর সেদিন আধুনিক জ্ঞানচর্চার পথিকৃৎ হিসাবে সব ভয়-ভীতি, চক্রান্ত, গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই হিন্দু কলেজের একদেশদর্শিতারও ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মিল, লক, হিউম্, বেনথাম জানতেন বটে কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন।

বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের কঠিন বাঁধন খুলে দিয়ে সহজ করে লিখলেন ব্যাকরণ কৌমুদী এবং উপক্রমণিকা। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্র সংস্কৃতের রসধারায় সিঞ্চিত হয়ে প্রাণবান হয়ে উঠল।

এতদিন হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই ডেপুটিগিরির সুযোগ পেতেন, এমনকি মাদ্রাসার ছাত্ররাও পেতেন কিন্তু সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা অযোগ্য বিবেচিত হতেন। এবার বিদ্যাসাগর দাবি করলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই এই সরকারি পদে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য; কারণ, বাংলার বুকে বাংলা ভালো না জানলে তার পক্ষে ডেপুটিগিরির কাজ করা সম্ভব নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যেমন ভালো বাংলা এবং সংস্কৃত জানে তেমনি তারা ভালো ইংরেজিও জানে; ফলে তাদের যোগ্যতাই এই কাজে সর্বাধিক। সংস্কৃত কলেজে প্রথম পাঁচটি শ্রেণিতে মিলটন, পোপ, এডিসন, কাউপার এবং ক্যাম্পবেল পড়ানো হত।

এরপর বিদ্যাসাগর পাঠদানের পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটান। বিদ্যাসাগরের আগে শ্রেণি বিভাজন ছিল না, ছিল বিষয় বিভাজন এবং এক একজন শিক্ষক এক একটি বিষয় পড়াতেন। যাঁরা সেই বিষয়টি পড়তে চাইতেন তাঁরা চলে যেতেন শিক্ষক মশাইয়ের কাছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই সমগ্র পাঠকে নানা শ্রেণিতে বিভাজিত করে দিলেন। ফলে সব শিক্ষকরাই বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়াতে যেতেন।

বিদ্যাসাগরের আগে শিক্ষকমশাইদের কলেজে আসার বা কলেজ থেকে চলে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোনো সময় ছিল না। বিদ্যাসাগর মশাই কলেজে শিক্ষকদের উপস্থিতি এবং সময়সূচি সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিয়ম করে দিলেন, স্থাপন করা হল সময়-জ্ঞাপক এক বিশাল ঘণ্টা। আগে ছুটি ছিল শীতকাল-ভর কিন্তু গ্রীষ্মে ছুটি কম। বিদ্যাসাগর মশাই শীতকালের দীর্ঘ ছুটি বন্ধ করে গ্রীষ্মকালে ছুটির সময় বাড়ালেন। আগে ছুটি ছিল অষ্টমী আর প্রতিপদে। বিদ্যাসাগর রবিবার দিন ছুটির দিন নির্দিষ্ট করে দিলেন। ঠিক করা হল আচরণবিধি। পণ্ডিতমশাইরা যে বেত হাতে যমদূতের মতো আবির্ভূত হতেন—তা নিষিদ্ধ হল। মোটের উপর পাঠে পুব-পশ্চিমের দিক্-বিরোধ বিদ্যাসাগর সর্বার্থে পরিত্যাগ করলেন।

যখন বিদ্যায়তনকে অবৈতনিক করার মধ্যেই মহানুভবতা এবং সার্বজনীন শিক্ষাদানের সহায়ক ব্যবস্থা বলে সর্বজনবিদিত ছিল, তখন বিদ্যাসাগর অবৈতনিক সরকারি সংস্কৃত কলেজে দু-টাকা ফি ধার্য করলেন। বিদ্যাসাগর দেখলেন, অবৈতনিক হওয়ায় যে কেউ এসে ভর্তি হত আবার যখন খুশি চলে যেত। কিন্তু ফি ধার্য হওয়ায় এই খেয়ালখুশির পাঠ বন্ধ হল। চলে গেলে নতুন করে টাকা দিয়ে আবার ভর্তি হতে হবে।

এইভাবে কয়েক বছরেই বিদ্যাসাগর শৃঙ্খলা স্থাপন করে বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠের সমস্ত ব্যবস্থা করেন।

এবার বিদ্যাসাগর দাবি করলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই এই সরকারি পদে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য; কারণ, বাংলার বুকে বাংলা ভালো না জানলে তার পক্ষে ডেপুটিগিরির কাজ করা সম্ভব নয়। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা যেমন ভালো বাংলা এবং সংস্কৃত জানে তেমনি তারা ভালো ইংরেজিও জানে; ফলে তাদের যোগ্যতাই এই কাজে সর্বাধিক।

বিদ্যাসাগর গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে কী ধরনের পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত তা নির্বাচনের দায়িত্ব দেন রেভারেন্ড জেমস লং-এর উপর; কারণ বিদ্যাসাগর মনে করতেন বাংলার গ্রামকে যেমন জেমস লং খুব ভালো করে চেনেন তেমনি বাংলার গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে রেভারেন্ড লং-এর অভিজ্ঞতা এই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে খুবই সহায়ক হবে।

গোঁড়া পণ্ডিত আর সমাজপতিদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সংস্কৃত কলেজের দ্বার বিদ্যাসাগরের সবার জন্য খুলে দিয়েছিলেন। আগে কেবল ব্রাহ্মণ আর বৈদ্যরা এখানে পড়তে পারত কিন্তু এবার ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যরাও ছাত্র হয়ে সংস্কৃতে পাঠ নেওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু শেষ অবধি শূদ্রদের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করতে হল। না হলে সমাজে যে প্রবল আলোড়ন উঠতে শুরু করেছিল তাতে সংস্কৃত কলেজই উঠে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বৃহত্তর স্বার্থে বিদ্যাসাগরকে সাময়িকভাবে পিছু হটতে হয়। কিন্তু সময় এবং সমাজের পশ্চাদপর অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিদ্যাসাগর যতখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন তাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। মনে রাখতে হবে, গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা বিদ্যাসাগরের ৭০ বছর পরেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শহীদুল্লাহকে শুধু সংস্কৃত পড়াতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একজন তো উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে জানান যে, যদি মুসলমানকে সংস্কৃত পাঠদান করতে হয় তবে তিনি গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেবেন। তাই সমাজটার অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামির কথা চিন্তা করে বিদ্যাসাগরের প্রগতিশীল মানসিকতার বিচার করা উচিত। বিদ্যাসাগর কতখানি মুক্তমনা ছিলেন তা বোঝা যায় যখন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' লেখেন বা Notes on Hindu Philosophy লেখেন, তখন নিয়মিত তিনি বিদ্যাসাগরের পরামর্শ নিতে আসতেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল ছাত্র এবং ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য হয়েও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে ইংরেজি দর্শন পাঠের পাশাপাশি ছাত্রদের বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শন পাঠ করা উচিত। বিদ্যাসাগর গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলিতে কী ধরনের পাঠ্যপুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত তা নির্বাচনের দায়িত্ব দেন রেভারেন্ড জেমস লং-এর উপর; কারণ বিদ্যাসাগর মনে করতেন বাংলার গ্রামকে যেমন জেমস লং খুব ভালো করে চেনেন তেমনি বাংলার গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ প্রয়োজন সম্পর্কে রেভারেন্ড লং-এর অভিজ্ঞতা এই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে খুবই সহায়ক হবে।

**রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**

বিদ্যাসাগর সারা জীবন চটি-জুতো, হেঁটো ধুতি এবং চাদর গায়ে দিয়ে খাঁটি বাঙালি পোশাকে সরল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। ইংরেজ-অনুকরণ সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু বাংলার শুভানুধ্যায়ী সৎ, চরিত্রবান ইংরেজদের তিনি গভীর শ্রদ্ধা করতেন। সেজন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. লেজার মার্শাল, শিক্ষাবিভাগের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ ময়েট এবং শিক্ষাবিভাগের প্রেসিডেন্ট ড্রিংকওয়াটার বেথুনের ছবি ইংরেজ চিত্রকরদের দিয়ে আঁকিয়ে তিনি নিজের বাড়িতে টাঙিয়ে রাখতেন। এতে বোঝা যায় জাতির শিক্ষা সংস্কারে যেমন নিজে জীবনের অর্থ, শ্রম, উদ্যোগ ব্যয় করেছিলেন তেমনি যাঁরাই এদেশে শিক্ষাবিস্তারে সহায়ক হয়েছেন তাঁদেরই তিনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

একদিকে যেমন নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপনে এবং তার প্রসারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তেমনি তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট স্থাপন। ভারতবর্ষের মধ্যে বিদ্যাসাগরই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইংরেজ অধ্যাপক না নিয়ে ইংরেজি কলেজ খুললেন এবং সেই কলেজের ছাত্ররা সুনামের অধিকারী হল। বিদ্যাসাগর পুবের ভিত্তির উপর পশ্চিমের জ্ঞানচর্চাকে স্থাপন করে পুব-পশ্চিমের মিলন ঘটিয়েছিলেন। যেহেতু জ্ঞানচর্চায় তিনি কোনো গোঁড়ামির তীব্র বিরোধী ছিলেন তাই ধর্মীয় কোনো কুসংস্কার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাই সংস্কৃত কলেজে অঙ্ক শেখানো শুরু করলেন ইংরেজিতে, আগে হত সংস্কৃতে। পড়ানো হত ভাস্করাচার্যের লীলাবতী ও বীজগণিত। সবই বিদ্যাসাগরের নির্দেশে ইংরেজিতে শেখানোর ব্যবস্থা হয়।

বিদ্যাসাগর বলেছেন তাঁর জীবনের সবথেকে বড়ো কীর্তি বিধবাবিবাহ প্রবর্তন। আলোকদীপ্ত রাজা রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের কাজকে যিনি পূর্ণতার পথে নিয়ে গিয়ে নবজাগৃতি বা রেনেসাঁসের প্রথম আলো জ্বেলে ছিলেন তিনি বিদ্যাসাগর।

অনেকে প্রশ্ন করেন যে বিদ্যাসাগর কেন বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য শাস্ত্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষা করছিলেন। যদি শাস্ত্রীয় অনুমোদন নাই থাকত তাহলে নৈতিকতা ও মানবিকতার উপর ভিত্তি করেই তো বিধবাবিাহকে আইনসম্মত করার জন্য আন্দোলন করা উচিত ছিল। কথাটা মিথ্যে নয়। এমন চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। ১৮৫৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর সমাজোন্নতি-বিধায়িনী সভা স্থাপিত হলে, কিশোরীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং অক্ষয় দত্তের এবং অন্যদের (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, গৌরদাস বসাক, সত্যচরণ ঘোষাল, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ) সমর্থনে বিধবার পুনর্বিবাহ আইন সম্মত করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

এই শ্লোকটিও অনেকের জানা ছিল কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই প্রাণপাত চেষ্টায় প্রমাণ করেন এটি পরাশরের শাস্ত্রবচন। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবা-বিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টার সমর্থনে শাস্ত্রীয় অনুমোদন খুঁজে বার করলেন যেখানে স্পষ্ট বলা আছে, যে পাঁচটি কারণে পুনরায় একজন নারী বিয়ে করতে পারেন তার মধ্যে তাঁর স্বামীর মৃত্যু একটি। বিদ্যাসাগর মশাই পরাশর সংহিতা থেকে শ্লোকটি উদ্ধার করায় আর কোনো পণ্ডিতের পক্ষে বিধবা বিবাহের শাস্ত্র-বিরোধিতার যুক্তি দেওয়া সম্ভব হল না। কিন্তু যে সমাজ জেনে-বুঝেই মেয়েদের ওপর-অত্যাচার আর শোষণ চালাবে বলে সংস্কার তৈরি করেছে সেই সমাজের স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা মেয়েদের শেকলের বাঁধন সহজে কাটবে কেন? তাঁরা বললেন, এখানে সেই বিধবাদের কথা বলা হয়েছে যারা বাগদত্তা। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আপনারা কোন ব্যাখ্যাকে মানবেন,—যেটা পুরনো এবং নির্ভরযোগ্য তাকেই তো? আপনারা যে সমস্ত পুরাণের উদাহরণ দিচ্ছেন তার থেকে পরাশর সংহিতা পুরনো এবং সর্বজনগ্রাহ্য। এই অকাট্য যুক্তির সামনে আর কারো মুখে কথা ফুটল না। বিদ্যাসাগর একটি বই লিখলেন, ‘‘বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব।’’

বিদ্যাসাগর বললেন, শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় আপনারা কোন ব্যাখ্যাকে মানবেন,—যেটা পুরনো এবং নির্ভরযোগ্য তাকেই তো? আপনারা যে সমস্ত পুরাণের উদাহরণ দিচ্ছেন তার থেকে পরাশর সংহিতা পুরনো এবং সর্বজনগ্রাহ্য। এই অকাট্য যুক্তির সামনে আর কারো মুখে কথা ফুটল না।

ভুলে গেলে হবে না সাধারণ মানুষের কাছে বিধবা-বিবাহ গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় না হলে কোনো তাঁতির সাহস হত না কাপড়ের পাড়ে এই গানের কথা বুনে দিতে। কাপড় বিক্রির সঙ্গে তাদের পেটের ভাতের সম্পর্ক, তাই গরিবদুখিরাও যে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এই বইখানি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় পুরোটাই প্রকাশ করা হল। চতুর্দিকে 'বিদ্যাসাগর হিন্দুধর্মের সর্বনাশ করলেন' বলে রব উঠল। যাঁরা এতদিন শাস্ত্রের কথা বলছিলেন, তাঁরা লোকভয়ে শাস্ত্রবাক্যের সহায়তায় বিধবা-বিবাহ সমর্থন তো দূরে থাক, তীব্রভাবে তার বিরোধিতা করতে কোমর বেঁধে এগিয়ে এলেন। বিদ্যাসাগর বাংলার পণ্ডিতদের এই দ্বিচারিতায় বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হলেন কিন্তু আরব্ধ ব্রত থেকে দূরে সরে এলেন না। হিন্দুদের জাত মারার জন্য বিদ্যাসাগর ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন—এই অভিযোগ তুলে বিদ্যাসাগরকে প্রাণে মারার চেষ্টা হতে লাগল।

ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে অজেয় পৌরুষ ছিল তারই প্রকাশ ঘটল, বাংলার সমাজ বিদ্যাসাগরের সিংহের বিক্রম দেখল। বাধা পেলে যেমন পাহাড়ি স্রোতস্বিনীর গতি তীব্রতর হয় তেমনি সমস্ত বাধা অতিক্রম করে আপন লক্ষ্যে এগিয়ে চললেন বিদ্যাসাগর। অকাট্য যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, তীক্ষ্ণধী বক্তব্য, প্রজ্ঞার দীপ্তি—সবকিছুর সমন্বয়ে তিনি আবার বই লিখলেন। সমাজের বিদগ্ধজনদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরে বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ প্রচলনের প্রচেষ্টাকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করলেন। পণ্ডিত ব্যক্তিদের একাংশ নিজ নিজ স্বার্থে যতই বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করুন, গ্রাম বাংলার দুঃখী নিরক্ষর নিপীড়িতা নারীসমাজ বিদ্যাসাগরকে আশীর্বাদ করে তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানালেন। গ্রামের তাঁতিরা বিদ্যাসাগরের নামে বিদ্যাসাগরি-শাড়ি বুনে শাড়ির পাড়ে বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি গাইলেন:

সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥

.....

এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখবে তাই—
আলোচাল কাঁচকলার মুখে দিয়ে ছাই,—
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় লয়ে॥

ভুলে গেলে হবে না সাধারণ মানুষের কাছে বিধবা-বিবাহ গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় না হলে কোনো তাঁতির সাহস হত না কাপড়ের পাড়ে এই গানের কথা বুনে দিতে। কাপড় বিক্রির সঙ্গে তাদের পেটের ভাতের সম্পর্ক, তাই গরিবদুখিরাও যে বিধবা-বিবাহের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

এই সময় বাংলার বুকে বিদ্যাসাগরের সব থেকে বড়ো সমর্থক ছিলেন ব্রাহ্মরা। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, কেশব সেন—এঁরা যেভাবে সভা-সমিতি করে পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে বিধবা-বিবাহের পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেন তাতে বিদ্যাসাগরের হাত শক্ত হয়।

বিদ্যাসাগর সব্যসাচীর মতো একদিকে শাস্ত্রীয় অনুমোদন, আরেকদিকে মানুষের বিবেকের সমর্থন—এই দুই-এর সমন্বয়ে বিধবা-বিবাহ প্রচলন আইনসম্মত করার জন্য প্রয়াস চালাতে থাকেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যদি বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় অনুমোদন না পেতেন তবে ইংরেজরা যতই বিদ্যাসাগরের প্রতি সহানুভূতিশীল হোক তাঁরা সাহস করে বিধবা-

বিবাহকে আইনসম্মত করতেন না। বিধবা-বিবাহকে আইনসম্মত করার জন্য সরকারের কাছে পক্ষে-বিপক্ষে প্রস্তাব আসতে থাকে। এইসব প্রস্তাবে সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর-সংবলিত গণস্বাক্ষর থাকত। যতজন মানুষ বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য স্বাক্ষর করেন তার থেকে অনেক বেশি মানুষ এই রকম কোনো আইনের বিরোধিতা করেন। হিসেব মতো ৯৮৭ জন মাত্র আইন প্রণয়নের পক্ষে স্বাক্ষর দান করে আর বিরোধিতা করেন প্রায় প্রায় হাজার তিরিশের মতো মানুষ।

আজকের অনেক শৌখিন বিপ্লবী এমন অনুযোগ করেন যে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রগতিশীল মানসিকতা নিয়ে আন্দোলন করতে পারতেন কিন্তু পুরনো পুঁথি ঘেঁটে সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করতে গেলেন কেন? যদি পুঁথিতে নাই পাওয়া যেত তা হলে কি বিধবা বিবাহ যুক্তিযুক্ত হত না? আমরা বিদ্যাসাগরের সময় ও সমাজটা ভুলে যাই বলেই এমন মন্তব্য করে থাকি। যখন আইন ছিল না তখন ক-জন প্রগতিশীল সাহসী যুবক বিধবা-বিবাহ করেছিলেন? এমনকি আইন হওয়ার পরও ক-জন এগিয়ে এসেছিলেন? আজ দেড়শো বছর পরও মানসিকতার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। সেজন্য বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় সমর্থন খোঁজার পেছনে সেদিন যথেষ্ট যুক্তি ছিল।

যখন সমাজে বাল্য-বিধবা এবং বহু-বিবাহ শাস্ত্রীয় বিধান বলে মান্যতা পেয়েছিল, তখন বাল-বিধবাদের দুরবস্থা যে কী ভয়ঙ্কর ছিল তা আজ অনুমান করাই কঠিন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিধবা-বিবাহকে আইনসম্মত করার কৃতিত্ব এবং গুরুত্ব কতখানি তা আজ অনুমান করা সহজ নয়। বাল-বিধবাদের মূলে বাল্যবিবাহ। তখনকার দিনে দেড় বছর বয়সেও বিয়ে হত। বিদ্যাসাগর নিজে বিয়ে করেন আট বছরের কন্যা দীনময়ী দেবীকে। নীচে সে-সময়কার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিয়ের সময় কনের বয়স কত ছিল দেওয়া হল:

| | **নিজের বিয়ের বয়স** | **স্ত্রীর বয়স তখন** |
|---|---|---|
| বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ১১ | ৫ |
| সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৭ | ৭ |
| দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৪ | ৬ |
| অমৃতলাল বসু | ১৫ | ৯ |
| জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর | ১৯ | ৮ |
| ভূদেব মুখোপাধ্যায় | ১৬ | ১১ |
| কেশবচন্দ্র সেন | ১৮ | ৯ |
| নবীনচন্দ্র সেন | ১৯ | ১০ |

এই তথ্য থেকে সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বোঝা গেলেও মূল সমস্যাটি অধরা থেকে যায়। উপরের তথ্যে আমরা পেলাম যাঁর সঙ্গে শিশুটির বা বালিকাটির বিয়ে হচ্ছে তার বয়েস সব থেকে বেশি ১৯ কিন্তু আসল সমস্যা ছিল তার বয়েস ৭০ থেকে ৮০ হওয়ায় বিচিত্র ছিল না। কৌলীন্য প্রথার এমন দাপট ছিল যে কুলমর্যাদা রক্ষার তাগিদে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনটি শিশুকন্যার একসঙ্গে বিয়ে দেবার ঘটনাও বিরল ছিল না। এই কারণে লোককথায় আমরা পাই—

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিনকন্যে দান।

অর্থাৎ বুড়ো শিবের সঙ্গে একসঙ্গে তিন মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

**জীবন্মৃত অবস্থায় সমাজ-পীড়নের শিকার এই বাল-বিধবারা সংসারে নারী হয়ে জন্মাবার অপরাধে প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করত।**

বিদ্যাসাগর মশাই যে অক্ষয় মনুষ্যত্বের ভিতের উপর নিজের জীবন গড়ে ছিলেন সেখানে লাঞ্ছনা, অপমান, তিরস্কার উপেক্ষা করে তিনি অটল ধৈর্যে আপন লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। সেজন্য তিনি আধুনিক মানুষ।

বৃদ্ধ স্বামী তো শ্মশানে পা-বাড়িয়ে রয়েছে, ফলে তাঁর মৃত্যু হলেই শিশু তিনটি বিধবা হবে। সারাটা জীবন সংসারের চিতার আগুনে তাদের ধিকি ধিকি পুড়ে মরতে হবে। সতী হলে একবারে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারা হত—সেও বোধহয় সারা জীবনের বৈধব্যদশার থেকে ছিল ভালো। জীবন্মৃত অবস্থায় সমাজ-পীড়নের শিকার এই বাল-বিধবারা সংসারে নারী হয়ে জন্মাবার অপরাধে প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করত। বালিকা-বিধবাকে একাদশী পালন করতে হত। সে এক অমানবিক ধর্মীয় বিধান। বাড়ির সবাই পিঠে-পায়েস, মণ্ডা-মিঠাই খেলেও জ্বরে প্রায় অচৈতন্য বালিকাটির মুখে একটু জল দেওয়ার উপায় ছিল না। এমনকি প্রয়োজনে মুখে ওষুধ দেওয়াও ছিল নিষেধ। এই ছিল সমাজের হিন্দু-বিধবাদের প্রতি সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান।

আজ বিধবা-বিবাহের গুরুত্বের কথা অনুধাবন করা কঠিন কারণ আজ না আছে সেই বাল্য-বিবাহ বা শিশুবিবাহ, আর না-আছে চূড়ান্ত অসম-বয়সের বিবাহ ফলে সমাজ থেকে বালবিধবার অভিশাপ অনেকটা দূর হয়েছে। বিদ্যাসাগর মশাই একই সঙ্গে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথাও দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। যুগসঞ্চিত সামাজিক যন্ত্রণা থেকে মানুষকে মুক্ত করা বড়ো সহজ কাজ নয়, কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই যে অক্ষয় মনুষ্যত্বের ভিতের উপর নিজের জীবন গড়ে ছিলেন সেখানে লাঞ্ছনা, অপমান, তিরস্কার উপেক্ষা করে তিনি অটল ধৈর্যে আপন লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। সেজন্য তিনি আধুনিক মানুষ। সময়ের প্রেক্ষাপটে সামাজিক গতিশীলতা বা সোসাল ডাইনামিক্সকে স্মরণে রেখে কোনো মনীষীর কাজের ধারা ও গুরুত্ব বিচার না করলে প্রায়শই মূল্যায়নে ভুল হয়ে যায়। শুধু ভারতবর্ষে কেন, সে সময় ইউরোপ, আমেরিকাতেও ধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, লোকাচারকে গুরুত্ব না দিয়ে যুক্তিনির্ভর সমাজ গঠনের কাজ শুরু হয়নি। ভারতবর্ষের বুকে সবেমাত্র পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিনির্ভরতার প্রথম আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিন্তু তখনো বেদ বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা হলে পণ্ডিতরা 'গেল গেল' রবে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রগতিশীল মানসিকতার যশস্বী পুরুষ যাঁর সাহিত্যে আমরা নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম নির্ঘোষ শুনতে পাই তিনিও বিধবা বিবাহ নিয়ে আইন প্রণয়নের বিরোধী ছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিধবা-বিবাহ আপনা থেকেই প্রচলিত হবে। বিধবা-বিবাহ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষ এখনো আমাদের কাঁটার মতো বিদ্ধ করে। বিষবৃক্ষে সূর্যমুখীর মুখ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয় সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?'

ভুললে হবে না বঙ্কিম জন্মেছেন বিদ্যাসাগরের থেকে আঠারো বছর পর। যদিও একথা ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একসময় যে-সব গোঁড়া সংস্কৃত পণ্ডিতরা বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সহমত পোষণ করতেন তাঁরাই সময়মতো মত পালটে এর বিরোধিতা করতে থাকেন। এর থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমস্ত হিন্দুসমাজটা সে-সময় ধর্মব্যবসায়ী পণ্ডিতদের ভয়ে কেমন কাঁটা হয়ে ছিল। তাই শাস্ত্র খুঁজে ফেরবার পেছনে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন দৃঢ়চেতা

বিদ্যাসাগরের কৌশলগত অস্ত্রের অনুসন্ধানই ছিল মূল লক্ষ্য। তাঁর এই কাজে তিনি তাঁর সংস্কৃত কলেজের সতীর্থ অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালংকারের আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছিলেন। অবশেষে ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাস হয়ে গেল। এই আইনের নাম: 'Act (xv) of 1856 being an act to remove all legal obstacles to the marriage of Hindu Widows.'

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম'-টিতে (তাঁর নিজের মূল্যায়নে) মন-প্রাণ সঁপে দিয়ে ক্রমশই আর্থিক দিক দিয়ে নিজে বিপন্ন হয়ে পড়েন। ৬০টি বিধবা বিবাহ দিতে ৮২ হাজার টাকা খরচ হয়ে যায়। তিনি কেবল আইন প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত হননি, সমাজে বিধবা-বিবাহ যাতে মর্যাদা পায় এবং প্রচলিত হয় তার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে থাকেন।

এই কারণেই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—যে কাজ তিনি আরম্ভ করেন তা তিনি শেষ করে তবে ছাড়েন।

বাংলা সাহিত্যে ও বাংলাভাষা বিকাশে বিদ্যাসাগরের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে অনেকখানি বিদ্যাসাগরের বদান্যতায়। সেই মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে 'এ দেশের প্রথম আধুনিক মানুষ' বলে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের আলোচনাতেও আমরা মধুসূদনের মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হতে পেরেছি। শুধু কাল বিচারে নয় আধুনিকতা একটি যুগ লক্ষণ। আজও সমাজজীবনে মানুষের স্বার্থপরতা, কুসংস্কার ও অমানবিক আচরণ আমাদের আধুনিকতা-বিমুখ করে রেখেছে। বিদ্যাসাগর মশাই চটি-জুতো, হেঁটো ধুতি আর চাদর গায়ে দিয়ে দেশজ পরিচ্ছদে মাথা উঁচু করে জ্ঞান আহরণে পুব-পশ্চিমের বিরোধ ঘুচিয়ে সমাজটাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার থেকে সামনে আলোর পথে হেঁটেছিলেন। আমাদের গর্ব আমরা তাঁর উত্তরসূরি, সমস্ত ক্ষুদ্রতা ও মলিনতার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগে তিনিই আমাদের আদর্শ, তিনিই আমাদের গুরু।

**টীকা:** (১)* The letter of Dr. J.R. Ballantyne, Principal of Benares Government Sanskrit College to the Council of Education in the year 1853.

&

The letter of Vidyasagar in reply to the Report of Dr. J.R. Ballantyne.

[State Archives, Education Department Govt. of W.B.]

**গ্রন্থসূত্র:** (১) বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ।

(২) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর—ইন্দ্রমিত্র।

(৩) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—স্বপন মুখোপাধ্যায়, পুনশ্চ।

(৪) Seminar Book on Vidyasagar 26th November, 2001. The Asiatic Society, Kolkata.

বিদ্যাসাগর মশাই চটি-জুতো, হেঁটো ধুতি আর চাদর গায়ে দিয়ে দেশজ পরিচ্ছদে মাথা উঁচু করে জ্ঞান আহরণে পুব-পশ্চিমের বিরোধ ঘুচিয়ে সমাজটাকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধকার থেকে সামনে আলোর পথে হেঁটেছিলেন।

# সাগরে আর এক ঢেউ

## কমলকুমার কুণ্ডু

এই ঢেউ কোনো লবণাক্ত সমুদ্রের নয়, এই ঢেউ এক পিতামহদেবের আদরের 'এঁড়ে বাছুর' ওরফে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা পৃথিবীতে শুধুই বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত ছিলেন যিনি, তাঁর অন্তরের ভেতরের ঢেউ। মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ এই হৃদয়বান মানুষটি তাঁর নানাবিধ কর্মকাণ্ডের জন্য 'করুণাসাগর' ও 'দয়ারসাগর' হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। কত মানুষকে নিশ্চিত বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। এই তালিকায় কলকাতায় পড়তে আসা পরবর্তীকালের প্রখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের পিতার মৃত্যুতে পড়া বন্ধ হওয়ার মুখ থেকে নবীনচন্দ্রকে যেমন বাঁচিয়েছিলেন, তেমনই আরও এক অগ্রগামী কবি মধুসূদন দত্ত লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে অর্থাভাবে সস্তায় থাকবে বলে স্ত্রী হেনরিয়েটাকে নিয়ে ফ্রান্সের ভার্সাই এসেও অনাহারের মুখে পড়ে বিদ্যাসাগরকে লিখলে নিজে ধার করে ৬০০০ টাকা পাঠিয়েছিলেন তিনি। মাইকেল সেজন্য তাঁকে বলেছিলেন করুণাসাগর—কবিতায় লিখেছিলেন 'করুণার সিন্ধু তুমি'। বিদ্যাসাগর উপাধি তো কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ১৮৩৯ সালের মে মাসের ১৬ তারিখে 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' পেয়েছিলেন নিমাইচাঁদ শিরোমণির তত্ত্বাবধানে আইন পড়ার সময়ে, যেখানে নামের উপাধি লেখা ছিল 'বিদ্যাসাগর'। বিদ্যাসাগর নামের

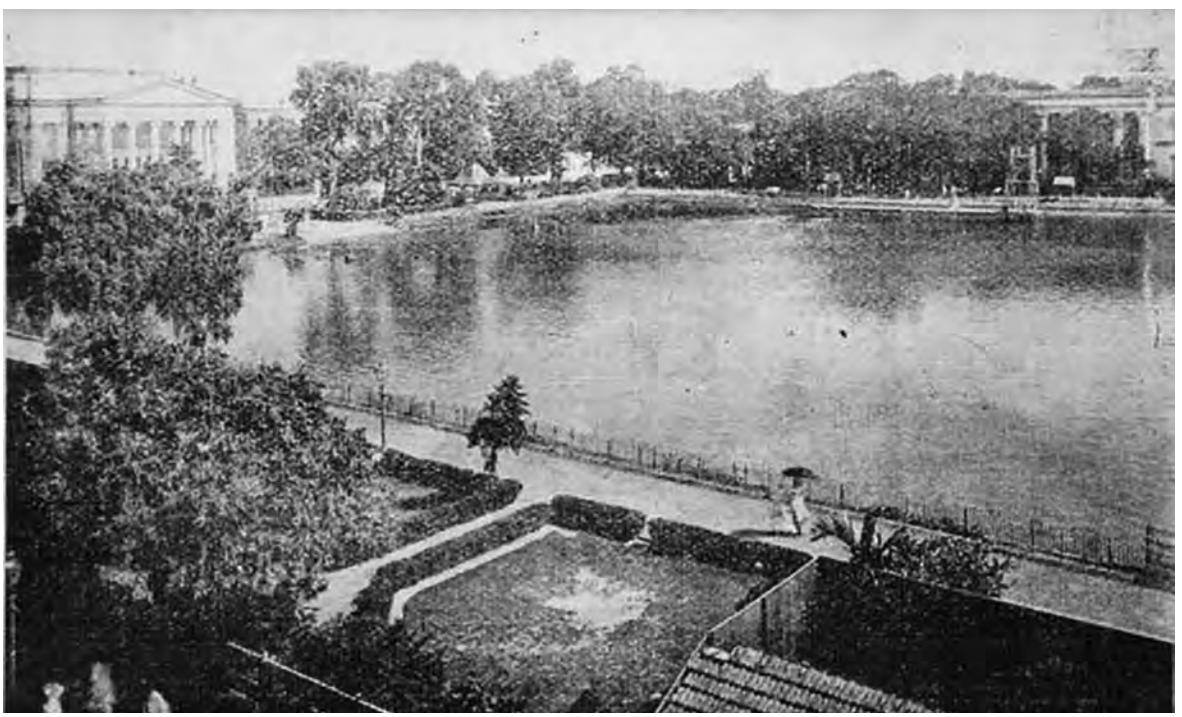

**পুরানো কলকাতার ছবিতে কলেজ স্কোয়ারের বাঁ দিকে সংস্কৃত কলেজ**

যথার্থতা দেখিয়েছেন তাঁর কর্মজীবন ও কর্মজীবনের পর আমৃত্যু অবসর জীবনযাপনের সময়েও।

কলকাতার সংস্কৃত কলেজের ছাত্র বিদ্যাসাগর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ১৮৪১-এর ডিসেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগ দিয়ে। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৮৪৬-এ সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর ১৮৪৭-এর মাঝামাঝি সাময়িক বিরতির পর ১৮৪৯-এর মার্চ মাসে পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ামে হেড রাইটার হিসেবে যোগ দিয়েও আবার ফিরে এসেছিলেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে এবং ১৮৫১-র ২২ জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে। আবার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বদলে 'বোর্ড অব একজামিনার' গঠন করা হলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ওই কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। বাঙালির বিদ্যাশিক্ষার প্রসার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অগ্রণী ভূমিকার কথাও সর্বজনবিদিত। ১৮৫৫-র ১ মে সহকারী স্কুল পরিদর্শক হয়ে মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় প্রতিটিতে ৫টি করে মোট ২০টি স্কুল খুলে দিয়েছিলেন ছোটোলাট হ্যালিডেকে সঙ্গে নিয়ে। বাঙালির শিক্ষারম্ভের বর্ণমালা শিক্ষার যে বই বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে ১৮৫৫-র ১৩ এপ্রিল এবং ১ মে লিখে চালু করে দিয়েছিলেন তা আজও একই ভূমিকায় অপরিহার্য হিসেবে চলমান। বহু জনপ্রিয় সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে বাঙালির পড়াশোনার ধারাকে সহজতর করে তুলেছিলেন। পৃথিবীর বহু বিখ্যাত মনীষীদের জীবনী যেমন কোপারনিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন এবং রবার্ট ও উইলিয়াম চেম্বার্সের লেখা জীবনীমূলক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে বিস্ময়াবিষ্ট বাঙালির শিক্ষার অঙ্গনে এক নতুন দিক উন্মোচন করে দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। পল্লবিত করে তুলেছিলেন বাঙালির মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায় তিনি সম্মাননাও পেয়েছেন প্রচুর।

বহু জনপ্রিয় সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করে বাঙালির পড়াশোনার ধারাকে সহজতর করে তুলেছিলেন।

**কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো সিনেট হল**

১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট'-এর প্রথম সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয় আর্টস ফ্যাকাল্টির একজন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

১৮৪৪-এ গভর্নর হেনরি হার্ডিঞ্জ দেশীয় মানুষদের মাতৃভাষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় ১০১টি বিদ্যালয় খুলেছিলেন, সেখানকার শিক্ষকদের নির্বাচন করার দায়িত্ব বর্তেছিল জি.টি. মার্শাল-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওপর। ১৮৫১-তে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠা হলে রাধাকান্ত দেব, হজসন, রেভারেন্ড লং, প্র্যাট, সেটন কার, জন রবিনসন এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে সদস্য হলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালে ভারত সরকার সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য কমিটি গঠন করলে বিদ্যাসাগর সেই কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট'-এর প্রথম সভায় বিদ্যাসাগর মহাশয় আর্টস ফ্যাকাল্টির একজন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন। একই সঙ্গে ওই বছরেরই ২৮ নভেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত, বাংলা, ওড়িয়া ও হিন্দি ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। ১৮৬৪-র জুলাই মাসের ৪ তারিখে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব ইংল্যান্ড'-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৮৭৬-এর ১৫ জানুয়ারি এক সভায় স্যার রিচার্ড টেম্পল-এর সভাপতিত্বে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হলে বিদ্যাসাগর ৬ জন ট্রাস্টির একজন ট্রাস্টি ছিলেন। ১৮৮০-র ১ জানুয়ারি ভারত সরকার তাঁকে সিআইআই সম্মাননায় ভূষিত করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হয়েছিলেন ১৮৮৩ সালে।

কিন্তু বিদ্যাসাগরমশাই তাঁর 'বিদ্যাসাগর' অভিধাকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের দেওয়া 'দয়ার সাগর' অভিধায় ভূষিত হওয়ায়। ১৮৬৬-র মে-জুলাই মাসে বাংলা ও ওড়িশায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মানুষ যখন দিশেহারা, বুভুক্ষু ও নিরন্ন, সেই দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া থেকে মেদিনীপুর জেলার নিজের জন্মস্থান বীরসিংহ-সহ আশপাশের বেশ কিছু গ্রামে অকাতরে অর্থব্যয় করে এবং অমানুষিক পরিশ্রম করে বিদ্যাসাগর হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য বহু এলাকায় বিনা পয়সায় অন্নসত্র খুলে দিয়ে নিজেই তদারকির কাজ করেছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি থেকে বেঁচে ফিরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিজেদের মতো করে 'দয়ার সাগর' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মানুষের দুঃখ-কষ্টে বিদ্যাসাগরের হৃদয় বিগলিত হয়েছিল বলেই তিনি 'দয়ার সাগর'। নানাভাবেই মানুষের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে গেছেন। তবে এই দয়ার সাগরের বেশি করে হৃদয় বিগলিত হত নারীদের জন্য। তাদের শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসা থেকে শুরু করে 'বহু বিবাহ' প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাড়াও 'বিধবা বিবাহ' আইন চালু করে বাল্য বিধবাদের পুনর্বিবাহ দেওয়া থেকে শুরু করে তাদের ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার জন্য বহুবিধ পন্থা বাতলে দিয়েছিলেন। মেয়েদের জন্য আলাদা করে তাঁর হৃদয়ে ঢেউ লাগত কেন এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে বিদ্যাসাগরের জীবনের চলবার রাস্তায়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে ১৭৪২ শকাব্দের ১২ আশ্বিন (১৮২০-র ২৬ সেপ্টেম্বর) মঙ্গলবার দ্বিপ্রহরে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখলেও পূর্বপুরুষদের আদি বাসভূমি ছিল

মেদিনীপুরের পাশের জেলা হুগলির জাহানাবাদ থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে বনমালীপুর গ্রামে। ওখানকার ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কার (বিদ্যাসাগরের পিতামহ) বীরসিংহের উমাপতি তর্করত্নের তৃতীয় কন্যা দুর্গাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে বিবাদের কারণে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন রামজয়। শ্বশুরবাড়ি নিরাপদ নয় ভেবে দুই পুত্র ও চার কন্যাকে নিয়ে বীরসিংহের বাপেরবাড়িতে দুর্গাদেবী চলে এলেও তৃতীয় ভ্রাতার অভব্যতার কারণে বাপের বাড়িতেও থাকা ছাড়তে হল। সব বুঝেই পিতৃদেব উমাপতি তর্করত্ন বাড়ির সন্নিকটে কন্যার জন্য একটি কুটির তৈরি করে দিয়েছিলেন। বাসস্থানের সংস্থান হলেও ছয় ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বড়োই অভাবের সংসার দুর্গাদেবীর। অগত্যা বড়ো ছেলে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪-১৫ বছর বয়সেই কিছু উপার্জনের জন্য বাধ্য হয়েই কলকাতায় চলে আসা। আবার কলকাতায় মাথা গোঁজার জন্য বারবার বিভিন্ন লোকের বাসায় থাকা বদল করতে হয়েছে। এরকমই ব্যবস্থায় অবশেষে ইংরেজি শিক্ষকের বাড়িতে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত হলেও তাঁর নিজেরই অসচ্ছলতার কারণে ঠাকুরদাসকে আহারের জোগান দিতে পারলেন না। আহারের জন্য নিজের থালাও বিক্রি করতে পারেননি ঠাকুরদাস। অগত্যা অভুক্ত অবস্থায় দ্বিপ্রহরে ঠনঠনিয়ার রাস্তার ধারে এক দোকানের মহিলা মালিককে একটু জল চাইলেন খিদের জ্বালায়। ভদ্রমহিলা ঠাকুরদাসের যে দুপুরের খাওয়া হয়নি তা বুঝতে পেরে কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। সেই সঙ্গে পাশের দোকান থেকে দই কিনে এনে ফলার করিয়েছিলেন। এরকম অবস্থা হলে তাঁর কাছে এসে খেয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন ওই ভদ্রমহিলা। ঠাকুরদাসও প্রায়ই তা করতেন। পিতৃদেব ঠাকুরদাসের কাছে এই করুনাঘন কাহিনি একবার শুনে তাঁর মনের অবস্থার কথা বিদ্যাসাগর তাঁর 'আত্মচরিত'-এ লিখেছিলেন যে, ''পিতৃদেবের মুখে এই হৃদয়বিদারক উপাখ্যান শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে যেমন দুঃসহ দুঃখানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির উপর তেমনই প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিয়াছিল। এই দোকানের মালিক, পুরুষ হইলে, ঠাকুরদাসের উপর, কখনই, এরূপ দয়াপ্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করিতেন না''।

সুতরাং, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীজাতির দুঃখ-কষ্টে নিজেও কষ্ট পেতেন খুব। সদাই চিন্তা করতেন কিভাবে এই স্ত্রীজাতির দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা যায়। বিশেষ করে বাল্যবিধবা মহিলাদের জন্য। প্রথমেই তাঁদের স্বাবলম্বী করে তুলতে নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই দেখি ছেলেদের শিক্ষার পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮৫৭-র নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র মে মাসের মধ্যে হুগলি জেলায় ২০টি, বর্ধমান জেলায় ১১টি, মেদিনীপুর জেলায় ৩টি এবং নদিয়া জেলায় ১টি মোট ৩৫টি স্কুল খুলে দিয়েছিলেন নিজের তত্ত্বাবধানে। ১৮৪৯-এ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কলকাতায় একটি মেয়েদের স্কুল স্থাপনা করলে বিদ্যাসাগর মহাশয় এর সম্পাদক হয়েছিলেন ১৮৫০ সালে। এছাড়াও তখনকার সমাজে প্রচলিত ছেলেদের বহু বিবাহ করার শাস্ত্রবিরোধী এই নীতির বিরোধিতা করেছিলেন। এর বাইরে বিদ্যাসাগরের সব থেকে প্রাণ কাঁদত বাল্যবিধবাদের জন্য। উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আর রামমোহন রায় মহাশয়দের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বেঁচে যাওয়া বিধবাদের

বাসস্থানের সংস্থান হলেও ছয় ছেলে-মেয়েকে নিয়ে বড়োই অভাবের সংসার দুর্গাদেবীর। অগত্যা বড়ো ছেলে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪-১৫ বছর বয়সেই কিছু উপার্জনের জন্য বাধ্য হয়েই কলকাতায় চলে আসা।

উইলিয়াম কেরি, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার আর রামমোহন রায় মহাশয়দের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বেঁচে যাওয়া বিধবাদের সমাজের, পরিবারের লোকজনদের গঞ্জনায় আর্থিক অনটনের দুর্নির্বার কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকার অসহ্য যন্ত্রণার কথা কেউ ভাবেননি। এমনকি যাঁদের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল তাঁরাও চিন্তা করেননি। চিন্তা করেছিলেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। চিন্তার ঢেউ উঠেছিল তাঁর মনে।

সমাজের, পরিবারের লোকজনদের গঞ্জনায় আর্থিক অনটনের দুর্নির্বার কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকার অসহ্য যন্ত্রণার কথা কেউ ভাবেননি। এমনকি যাঁদের প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রদ হয়েছিল তাঁরাও চিন্তা করেননি। চিন্তা করেছিলেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। চিন্তার ঢেউ উঠেছিল তাঁর মনে। তিনি এই দুস্থ বিধবা মহিলাদের কথা মাথায় রেখে দুটি ফলপ্রসূ প্রচেষ্টার কথা ভেবে সেগুলিকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন এঁদের সম্মান-সহ পুনর্বাসনের জন্য। প্রথমটি হল বিধবা বিবাহ আইন পাশ করে বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন। এবং দ্বিতীয়টি হল পুনরায় বিধবা বিবাহ না হওয়া বিধবাদের জন্য মাসিক একটা খরচ চালানোর মতো কিছু টাকার সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

প্রথম ব্যবস্থায় তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল ১৪বছর বয়সের তাঁর ছোটোবেলার খেলার সাথী যখন বিধবা হয়েছিলেন তখন তিনি নিজে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। ওই বিধবার স্বাচ্ছন্দ্যহীন একবেলা খেতে পাওয়া জীবনের সঙ্গে সামাজিক নানান নিপীড়নের জ্বালা দেখে বিদ্যাসাগর শিউরে উঠেছিলেন। ১২বছর বয়সী এই মেয়েকে বিধবা হতে দেখে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী কেঁদে ভাসিয়ে নিজের ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে শাস্ত্রে কি কোনো বিধান নেই এদের আবার বিয়ে দেওয়ার। প্রতিকারে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৫৫ সালের ২৪ জানুয়ারি হিন্দু শাস্ত্র বিধানের বিধি উল্লেখ করে বিধবা বিবাহকে সমর্থন করে জনসাধারণকে অবহিত করেছিলেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা' নামের বইটি লিখে প্রকাশ করে। সারাদেশ তোলপাড় হয়ে গেল বিদ্যাসাগরের এই বইটি পড়ে। এই বছরেরই ৪ অক্টোবরের কাছাকাছি হাজার লোকের সই দিয়ে আবেদন জানালেন বিদ্যাসাগর 'ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'-এর কাছে 'বিধবা পুনর্বিবাহ আইন' চালু করবার জন্য। এই মাসেই এই বিষয়ে আবার একটি বই লিখলেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা— এতদ্‌বিষয়ক প্রস্তাব।' ডিসেম্বর মাসের ২৭ তারিখে 'ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল'-এর কাছে আবেদন করলেন বহুবিবাহ বন্ধ করার জন্য। অবশেষে ১৮৫৬-র ১৬ জুলাই বিধবা পুনর্বিবাহ আইন চালু করে দিলেন ভারত সরকার। এরপর নিজপুত্র নারায়ণচন্দ্রের সঙ্গে বিধবা ভবসুন্দরীর বিবাহ-সহ অনেক বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, নিজের গাঁটের টাকা খরচ করে। তবে প্রথম বিধবা বিবাহটি একটু উল্লেখের দাবি রাখে। ১৮৫৬-র ৭ ডিসেম্বর বন্ধুবর রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে গুণীজন সমাবেশে এবং গণ্ডগোলের আশঙ্কায় ব্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন রেখে যে বিধবা বিবাহটি সম্পন্ন করেছিলেন বিদ্যাসাগর ১০ হাজার টাকা খরচ করে, তার পাত্র মুর্শিদাবাদের খাটুয়ার রামধন তর্কবাগীশের পুত্র সংস্কৃত কলেজেরই ছাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, আর তার পাত্রী পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কালীমতী। পাত্রীর বিবাহ হয়েছিল ৪ বছর বয়সে, বিধবা হয়েছিল ৬ বছর বয়সে এবং পুনর্বার বিধবা বিবাহ হয়েছিল ১০ বছর বয়সে। এই বিধবা বিবাহের প্রবর্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ১৮৭৭-এর ১ জানুয়ারি দিল্লির দরবার উপলক্ষে ভারতসম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত এক শংসাপত্র ভারতের গভর্নর জেনারেলের নির্দেশে বাংলার ছোটোলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল অর্পণ করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের প্রভাব পড়েছিল সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। মহারাষ্ট্রে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও ১৮৬১ সালে এমজি রানাডে সেখানে 'দি উইডো রিম্যারেজ অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করে ফেললেন। ওখানকার বিষ্ণু পরশুরাম পণ্ডিত-এর ভূমিকা খুবই প্রাণদায়ক। তিনি শুধু 'পুনর্বিবাহ উত্তেজক মণ্ডলী'-ই তৈরি করেননি, বিদ্যাসাগরের বিধবা পুনর্বিবাহ নিয়ে বাংলা বইকে অনুবাদ করলেন মারাঠিতে ১৮৬৫ সালে। পাণ্ডুরাম কর্মকারের সঙ্গে ১৬ বছর বয়সী বিধবা বেনুবাই-এর বিবাহও দিলেন এবং নিজে একজন বিধবাকে বিবাহ করেছিলেন। রমনলাল সোনি মোদাসা বিদ্যাসাগরের বই গুজরাটিতে অনুবাদ করে ছড়িয়ে দিলেন বিদ্যাসাগরের নাম সারা গুজরাটে। সমাজের মহিলাদের দুঃখ-কষ্টের আন্দোলনে বিদ্যাসাগর যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সে কথা বলেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের বীরেশ লিঙ্গম। তিনি তাঁর দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশে 'উইডো রিম্যারেজ অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেছিলেন ১৮৮০-তে। তারপর ১৮৮১-র ১১ ডিসেম্বর রাজামুন্দ্রিতে বিধবা বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। তামিলনাড়ুর এমভি বেঙ্কটরাও 'পলিনিয়াপ্পা ব্রাদার্স' থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন।

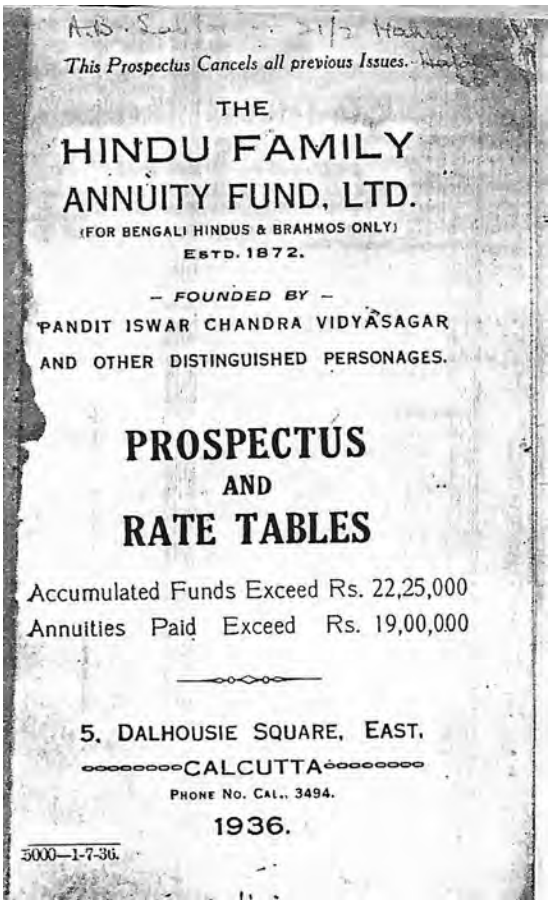
This Prospectus Cancels all previous Issues.

THE
HINDU FAMILY
ANNUITY FUND, LTD.
(FOR BENGALI HINDUS & BRAHMOS ONLY)
ESTD. 1872.

— FOUNDED BY —
PANDIT ISWAR CHANDRA VIDYASAGAR
AND OTHER DISTINGUISHED PERSONAGES.

PROSPECTUS
AND
RATE TABLES

Accumulated Funds Exceed Rs. 22,25,000
Annuities Paid Exceed Rs. 19,00,000

5, DALHOUSIE SQUARE, EAST.
CALCUTTA
PHONE NO. CAL., 3494.
1936.

5000—1-7-36.

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারী কল্যাণের উন্নয়নের দ্বিতীয় সংস্থান হল যে-সব বিধবা মহিলার বিবাহ হবে না তাঁদের স্বামী মারা গেলে তাঁরা যাতে করে কিছুটা সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্য মাসে মাসে পেনশন পেতে পারেন তার বিধি-ব্যবস্থা চালু করা। এটাই সাগরের হৃদয়ের মুখ্য আর এক ঢেউ। কেননা বাড়ির গৃহকর্তা বা রোজগেরে অন্য কেউ মারা গেলে তার পরিবারের সদস্যদের কী করুণ অবস্থা হয় তা ভালোভাবে অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন দয়ার সাগর। সেজন্য এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে ভারতবর্ষে প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে স্থাপন করেছিলেন 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড' নামে একটি অর্থনৈতিক জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান, যখন কোনো ভারতীয় জীবন বিমা প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা চিন্তাও করতে পারেননি। এর মাত্র ২ বছর আগে ১৮৭০-এ ভারতবর্ষে বিমা ব্যবসায়কে চালু করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট পাশ করে। প্রথম প্রথম জাহাজভর্তি নানা দ্রব্যাদির উপর বীমা প্রযোজ্য হলেও ওই বছরই ব্রিটিশরা 'বোম্বাই মিউচুয়াল লাইফ অ্যাসুরেন্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে মানুষের জন্যও জীবন বিমা করবার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতবর্ষে ভারতীয়দের জন্য জীবন বিমাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে বিধবাদের স্বার্থে ১৮২৭-এ 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড' সৃষ্টি করেন। ১৯৩৬ সালে সংস্থার তরফে ৫নং ডালহৌসি স্কোয়ার, ইস্ট, কলকাতা থেকে (ফোন নং ক্যাল-৩৪৯৪) প্রকাশিত 'The Hindu Family Annuity Fund Ltd.'-এর একটি Prospectus আমরা এই প্রতিষ্ঠানের শুরুর সময় ১৮৭২-এর ১৫ জুন থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সময়সীমার নানা খবরাখবর পেয়ে যাই যদিও পরবর্তী সময়ের দুই-একজন লেখক তাঁদের লেখায় সামান্য ঋণ স্বীকারও করেনি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারী কল্যাণের উন্নয়নের দ্বিতীয় সংস্থান হল যে-সব বিধবা মহিলার বিবাহ হবে না তাঁদের স্বামী মারা গেলে তাঁরা যাতে করে কিছুটা সুস্থভাবে জীবন-যাপন করতে পারে তার জন্য মাসে মাসে পেনশন পেতে পারেন তার বিধি-ব্যবস্থা চালু করা।

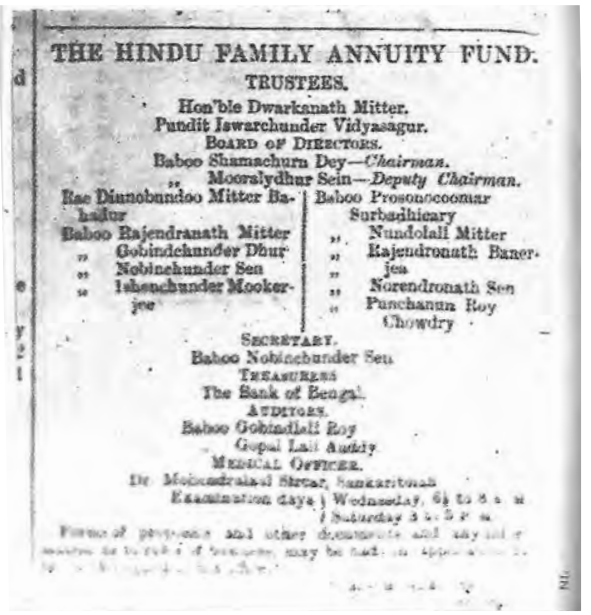

THE HINDU FAMILY ANNUITY FUND.

TRUSTEES.

Hon'ble Dwarkanath Mitter.
Pundit Iswarchunder Vidyasagur.

BOARD OF DIRECTORS.

Baboo Shamachurn Dey—*Chairman.*
" Mooralydhur Sein—*Deputy Chairman.*

Rae Dinnobundoo Mitter Bahadur
Baboo Rajendranath Mitter
" Gobindchunder Dhur
" Nobinchunder Sen
" Ishenchunder Mookerjee
Baboo Prosonocoomar Surbadhicary
" Nundolall Mitter
" Rajendronath Banerjea
" Norendronath Sen
" Punchanun Roy Chowdry

SECRETARY.

Baboo Nobinchunder Sen

TREASURERS

The Bank of Bengal.

AUDITORS.

Baboo Gobindlall Roy
" Gopal Lall Auddy

MEDICAL OFFICER.

Dr. Mohendralaul Sircar, Sankaritolah
Examination days { Wednesday, 6½ to 8 a. m. / Saturday 3 to 5 p. m.

[illegible]

অ্যানুইটি ফান্ডের ওই প্রসপেক্টাস থেকে সমসাময়িক পত্রপত্রাদির কিছু মন্তব্য আমরা জানতে পারি। ১৮৭২-এর ২০ জুন তারিখের Indian Mirror জানিয়েছিল, "When we reflect on the miserable condition of the Hindu widow when she is left unprovided for by the death of her husband, when we call to our mind the suffering and the deprivation of an orphan child, we can not but be sanguine that the cause which the promoters of the Fund have expoused will meet with a ready support and enlist the largest amount of public sympathy." ১৯৩৩-এর জানুয়ারি মাসের 'Insurance World' মন্তব্য করেছিল, "The versatile genius of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar left no stone unturned for the promotion of social well being. Not only the spiritual or moral uplift of his countrymen was his sacred mission, but their material welfare also was of great concern to him. He conceived truly that material welfare is conducive to the spiritual welfare of the community. The product of such a brilliant conceptive as his, was the Hindu Family Annuity Fund, established in 1872. It is a purely philanthropic institution based on co-operation principles. Profit earning is not its end. It is meant to provide a monthly income after the death of the subscriber, for the maintenance of widows, children and dependent relatives." ১৯৩৪-এর জানুয়ারি মাসের 'Financial Express' লিখল, "Of the many notable institutions founded by late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, the Hindu Family Annuity Fund Ltd., is the pioneer in the field of social service. It was founded in 1872 with the objective of securing monthly pension to the widows and other dependents of its members...."

১৮৭২-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতার মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনে (বর্তমানের বিদ্যাসাগর কলেজ) এক সভা ডাকা হল আলোচনার জন্য। এই সংস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা হলেন—

১. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সিআইই,
২. বাবু নবীন চন্দ্র সেন, ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের দেওয়ান,
৩. রায় শ্যামচরণ দে বাহাদুর, অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পট্রোলার জেনারেল, ভারত,
৪. মহারানী স্বর্ণময়ী, সিআই, কাশিমবাজার,
৫. রানী শরৎসুন্দরী দেবী, পুটিয়া,
৬. কুমার গিরীশ চন্দ্র সিং বাহাদুর, পাইকপাড়া রাজ,
৭. অনারেবল জাস্টিস দ্বারকা নাথ মিত্র,
৮. অনারেবল জাস্টিস স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র, কেটি.,
৯. মহারাজা স্যার যতীন্দ্র মোহন টেগোর, কেসিএসআই,

১০. ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, এমডি, সিআইই।

এছাড়াও সূচনায় যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন :

১. দীনবন্ধু মিত্র, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নীলদর্পণের লেখক,
২. নরেন্দ্রনাথ সেন, ইন্ডিয়ান মিরর-এর সম্পাদক,
৩. মুরলীধর সাঁই (প্রতিষ্ঠানের ডেপুটি চেয়ারম্যান),
৪. কৃষ্ণদাস পাল (শোভাবাজার এস্টেট),
৫. দীননাথ ঘোষ (চিফ সুপারিন্টেডেন্ট, অর্থদপ্তর, ভারত সরকার),
৬. রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি, অর্থদপ্তর, ভারত সরকার),
৭. রামশংকর সেন (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সদস্য বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল)
৮. কালীচরণ ঘোষ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট),
৯. গোবিন্দচন্দ্র ধর (বিশিষ্ট নাগরিক),
১০. রাজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী (বিশিষ্ট নাগরিক),
১১. পঞ্চানন রায়চৌধুরী (বিশিষ্ট নাগরিক),
১২. প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (বিশিষ্ট নাগরিক),

(সূত্র : ধীরেশ ভট্টাচার্য, বিদ্যাসাগর অ্যান্ড ফ্যামিলি ইন্স্যুরেন্স ইন ইন্ডিয়া, দি গোল্ডেন বুক অব বিদ্যাসাগর, মুখ্য সম্পাদনা, মানিক মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, ১৯৯৩, কলকাতা।)

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড-এ সূচনাপর্বে যাঁরা পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন তাঁরা হলেন—

ট্রাস্টিস—

১. অনারেব্‌ল জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র
২. পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস—

১. বাবু শ্যামচরণ দে—চেয়ারম্যান
২. মুরলীধর সাঁই—ডেপুটি চেয়ারম্যান
৩. রায়বাহাদুর দীনবন্ধু মিত্র (সদস্য)
৪. বাবু প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী (সদস্য)
৫. বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (সদস্য)
৬. বাবু গোবিন্দ চন্দ্র ধর (সদস্য)
৭. বাবু নবীন চন্দ্র সেন (সম্পাদক)
৮. বাবু ঈশানচন্দ্র মুখার্জী (সদস্য)
৯. বাবু নন্দলাল মিত্র (সদস্য)
১০. বাবু রাজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (সদস্য)
১১. বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন (সদস্য)
১২. পঞ্চানন রায়চৌধুরী (সদস্য)

অন্যান্য—

১. ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল—ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট/কোষাধ্যক্ষ
২. বাবু গোবিন্দলাল রায় ও গোপাললাল আঢ্য—অডিটর্স

**হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড-এর শুরুর বাড়ি**

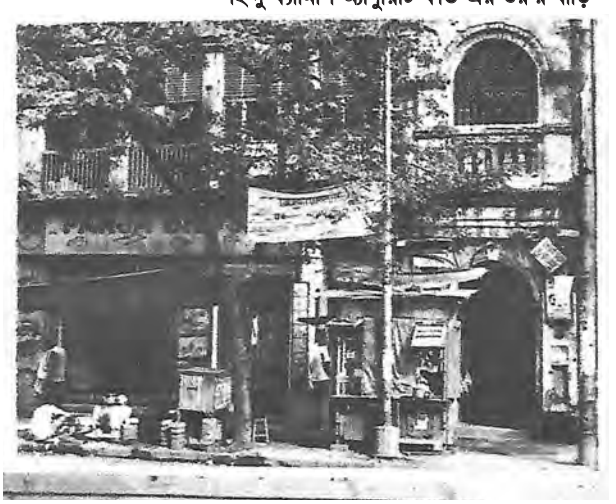

বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো দান করেছিলেন কিনা প্রত্যক্ষভাবে কোনো হদিশ পাওয়া না গেলেও অপ্রত্যক্ষভাবে জানতে পারা যাচ্ছে যে এই অ্যানুয়িটি ফান্ডের সূচনা বর্ষ ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তখনকার 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল' থেকে (বর্তমানের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) ৬২০০ টাকা ঋণ নিতে হয়েছে।

৩. ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার—মেডিকেল অফিসার, দেখার সময়—বুধবার সকাল ৬.৩০ থেকে ৮টা, শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৫টা।

(সূত্র: দি গোল্ডেন বুক অব বিদ্যাসাগর, মুখ্য সম্পাদনা, মানিক মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য, ১৯৯৩, কলকাতা।)

২ জন ট্রাস্টি এবং ১২ জন বোর্ড অব ডাইরেক্টরস নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড'-এর যাত্রা শুরু কলকাতার ৩২নং কলেজ স্ট্রিটের (বর্তমানে ৩২এ কলেজ স্ট্রিট) এক বাড়িতে ১৮৭২-এর ১৩ জুন থেকে। পরে চলে আসে ৫নং ডালহৌসি স্কোয়ার ইস্ট-এ। ১০জন গ্রাহক নিয়ে পথ চলা শুরু এই প্রতিষ্ঠানের। কিছু দানও সংগ্রহ করা হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজা দিয়েছিলেন ২০০০ টাকা সমেত আরও কিছু সম্পদ। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো দান করেছিলেন কিনা প্রত্যক্ষভাবে কোনো হদিশ পাওয়া না গেলেও অপ্রত্যক্ষভাবে জানতে পারা যাচ্ছে যে এই অ্যানুয়িটি ফান্ডের সূচনা বর্ষ ১৮৭২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তখনকার 'ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল' থেকে (বর্তমানের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া) ৬২০০ টাকা ঋণ নিতে হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কলকাতা সার্কেলের মুখপাত্র 'বিকাশ'-এর এক সংখ্যা থেকে এই ঋণ নেওয়ার ব্যাপারটি জানা যাচ্ছে। তাই মনে করা হচ্ছে হয়তো বা ওই ঋণ নিয়ে তিনি দান করেছিলেন 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড'-এ।

বেশ কিছু নিয়মের বাঁধনে জড়ানো ছিল এই সংস্থার কর্মকাণ্ডগুলি। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সের বেঙ্গল কমিউনিটির হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও বুদ্ধিস্ট মানুষই গ্রহণ করতে পারতেন। নিয়ম করা হয়েছিল প্রতি মাসে ৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা হবে এর গ্রাহক চাঁদা। পরে বেড়ে হয়েছিল ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা। গ্রাহকদের বয়সসীমা হতে হবে ১৯ বছর থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে। এই গ্রাহকরাই নির্বাচন করতে পারতেন বোর্ড অব ডাইরেক্টরসদের। ডাইরেক্টরসরা সবাই অনারারি সদস্য। অ্যানুয়িটি কেনবার সময় গ্রাহককে তার বয়স জানাতে হবে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন বিদ্যাসাগরের সমস্ত ধরনের কল্যাণকামী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সেস'-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। গ্রাহকের মৃত্যুর পরে পরেই নির্ধারিত নমিনিকে টাকা দেওয়া শুরু হয়ে যাবে।

এই অ্যানুয়িটি ফান্ডের দপ্তর ডালহৌসি থেকে পরে চলে যায় পি-১৩, মিশন রো, কলকাতার নিজস্ব বাড়িতে। ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল ভারতীয় জীবন বিমা নিগম ১৯১৩-এর কোম্পানি অ্যাক্ট এবং ১৯৩৮-এর দি ইন্স্যুরেন্স অ্যাক্ট অনুসারে। ১৯৫৬ সালে জাতীয়করণ হওয়ার পর বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' মিশে যায় ওই 'ভারতীয় জীবন বিমা নিগম'-এর সঙ্গে। বৈধব্য চলাকালীন বিধবা মহিলাদের ভরণপোষণের ক্ষেত্রে এই অ্যানুয়িটি ফান্ড ভালোরকম পরিষেবা দিয়ে এসেছিল যদিও কালের গতিতে মূল্যমান কিছুটা কমে এসেছিল। তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবদ্দশার পুরো সময়টা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেননি। ১৮৭৫-এর ডিসেম্বর মাসে বাধ্য হয়েই

এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। কারণ অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বুঝেছিলেন তাঁর বেশকিছু সহযোগীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন নিজেদের স্বার্থের জন্য, গ্রাহকদের স্বার্থের জন্য নয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠান থেকে বিযুক্ত হয়েছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং রমেশচন্দ্র মিত্র। একথা অবশ্যই মানতে হবে যে উনিশ শতকে সাগর তাঁর অনেক ঢেউয়ের তরঙ্গের মতোই মহিলাদের প্রাপ্য অধিকারের ঢেউকে যেভাবে তরঙ্গায়িত করে তুলেছিলেন তা সেই সময়ে বিশ্বের আর কোনো দেশ এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই সাগরকে তুলনা করেছিলেন বটবৃক্ষের সঙ্গে। সেজন্য তিনি তাঁর গুরুদক্ষিণার প্রণাম জানাতে জীবনসায়াহ্নে সাগরের ঢেউয়ে আছড়ে পড়তে মেদিনীপুর শহরে গুরু বিদ্যাসাগরের স্মৃতি মন্দির ১৯৩৯-এর ডিসেম্বর মাসের ১৫ তারিখে দ্বারোদ্ঘাটন করতে এসে শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে বলেছিলেন—

'সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে আমি তার (বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির) দ্বার উদঘাটন করি.... বঙ্গ সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোক যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি সমাজের দ্বার উদঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'

'অনাথা নারীদের প্রতি যে করুণায় তিনি সমাজের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে প্রবল শক্তিতে আঘাত করেছিলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠতা আরও অনেক বেশী। কেননা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কেবলমাত্র তাঁর ত্যাগশক্তি নয় তাঁর বীরত্ব।'

তাঁর জন্মদ্বিশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁরই ঢেউয়ে আমরা যেন সিঞ্চিত হতে পারি। এটাই প্রার্থনা।

একথা অবশ্যই মানতে হবে যে উনিশ শতকে সাগর তাঁর অনেক ঢেউয়ের তরঙ্গের মতোই মহিলাদের প্রাপ্য অধিকারের ঢেউকে যেভাবে তরঙ্গায়িত করে তুলেছিলেন তা সেই সময়ে বিশ্বের আর কোনো দেশ এমনকি ইউরোপ ও আমেরিকাতেও গড়ে ওঠেনি।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দির

# প্রান্তিক মানুষের বন্ধু

# বিদ্যাসাগর

## বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭৩ সাল। বিদ্যাসাগরের বয়েস তখন তিপ্পান্ন। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে জীর্ণ, অবসন্ন তাঁর হৃদয়। সারাটি জীবন আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই আদর্শ পদে-পদে প্রবল সংঘাতের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। আপস করে বাঁচার কথা ভাবতে পারতেন না বিদ্যাসাগর। তাই আদর্শ বিঘ্নিত হলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গ পরিত্যাগ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। জীবিকার তাগিদ কখনোই তাঁকে আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ১৮৫৮ সালে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়েসেই নীতিগত বিরোধের কারণে সরকারি চাকুরি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন তিনি। তাঁর নিজের হাতে গড়া ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়ের দায়দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে না চাওয়ায় তিনি সেই স্কুলগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে দুরন্ত সাহসের পরিচয় রেখেছিলেন।

হাসিমুখেই এইসব বরেণ্য সামাজিক কাজ ধারাবাহিকভাবে করেছিলেন তিনি, পরার্থে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর কাঁধে বিপুল ঋণের বোঝা চেপে বসেছিল, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ তাঁর প্রতি সহযোদ্ধার মনোভাব দেখায়নি, ফলে তিনি মনের দিক থেকে ছিলেন ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত।

বিধবাবিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে তিনি যে হতভাগ্য বিধবা রমণীদের বিবাহ দিয়েছিলেন (হুগলি জেলার আরামবাগ জাহানাবাদ মহকুমাতেই ১৫টি বিধবার বিবাহের আগাগোড়া সকল আয়োজনই করেছিলেন। অন্যান্য জেলাতেও তাঁর সামগ্রিক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় অনেকগুলি বিধবা রমণীর বিবাহ হয়েছিল), তাদের নবজীবন দান করতে গিয়ে তিনি বিবাহ সংক্রান্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব পুরোটাই গ্রহণ করেছিলেন। এমন কি, বিবাহ-পরবর্তী জীবনে তাদের যাতে সংসার চালাতে অসুবিধা না হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজস্ব অর্থ ব্যয় করে সেই দায় গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে। হাসিমুখেই এইসব বরেণ্য সামাজিক কাজ ধারাবাহিকভাবে করেছিলেন তিনি, পরার্থে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর কাঁধে বিপুল ঋণের বোঝা চেপে বসেছিল, কিন্তু সমসাময়িক সমাজ তাঁর প্রতি সহযোদ্ধার মনোভাব দেখায়নি, ফলে তিনি মনের দিক থেকে ছিলেন ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত।

বিদ্যাসাগরের এই ব্যতিক্রমী জীবনের চিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছেন, ''...বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁর স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।...তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না...এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।''

বীরসিংহের পরিবেশ, বিশেষত তাঁর আত্মীয়স্বজনের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দিনে দিনে আদর্শবিরোধী ও অসহনীয় হয়ে ওঠায় বিদ্যাসাগর পাকাপাকিভাবে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। ভেবেছিলেন, কলকাতায় খানিকটা একা থাকতে পারবেন। কিন্তু সেখানেও আত্মীয়-পরিজন ও সাহায্যপ্রার্থীদের ভিড় লেগেই রইল, আমহার্স্ট স্ট্রিটের ভাড়াবাড়ির একটি অংশে শুরু হল মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন, সমসময়ের নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে তাঁর সংযোগ অব্যাহত রইল। কলকাতাতেই ১৮৭০ সালে তিনি একমাত্র পুত্র নারায়ণের বিবাহ দিয়েছিলেন বাল্যবিধবা ভবসুন্দরীর সঙ্গে, কেননা তিনি নিজের ঘরের উদাহরণ সামনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সারবত্তা। বিবাহ হল বটে কিন্তু নারায়ণ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রবল দুর্ব্যবহার শুরু করেন, ফলে যারপরনাই ক্রুদ্ধ হলেন বিদ্যাসাগর এবং ১৮৭২ সালে 'ত্যাজ্য' করেন নারায়ণকে।

১৮৭১ সালে প্রয়াত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী। জননীর প্রয়াণে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন যেহেতু তাঁর জীবনে আদর্শের সমূহ রূপায়ণে মহৎপ্রাণস্বরূপা ভগবতী দেবীই ছিলেন একমাত্র প্রেরণা। ১৮৭২ সালে পুত্রের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ঠিক পরে বছরে অর্থাৎ ১৮৭৩ সালে বড়ো জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতির প্রয়াণ ও তাঁর দুই পুত্রের ভার গ্রহণ, কন্যা হেমলতার বৈধব্যে তাঁর অপরিহর মনোবেদনা, আত্মীয়বর্গের সঙ্গে নিরন্তর মনোমালিন্য, ঋণের জন্য অবিরাম দুশ্চিন্তা প্রভৃতি নানা কারণে তিনি খানিকটা বাধ্য হয়েই স্থির করেছিলেন ঋণ পরিশোধ মোটামুটি সম্পূর্ণ হলে কলকাতা ছেড়ে চলে যাবেন প্রকৃতির কোলে কোনো একটি মনোরম গ্রাম্য জনপদে, যেখানে হয়তো বা তিনি খুঁজে পাবেন

প্রাণের আরাম। তাছাড়াও তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁকে বারেবারে পরামর্শ দিয়েছিলেন—তিনি যেন কিছুদিনের জন্য নির্জন কোনো স্থানে গিয়ে বায়ু পরিবর্তন করে আসেন। ফলে, বিদ্যাসাগর নিজেকে ক্রমশ প্রস্তুত করলেন নির্জনবাসের জন্য—যা কার্যত হয়ে উঠল তাঁর জীবনের গৌরবময় কর্ম-প্রণোদনের বিশেষ একটি অভিমুখ, নতুনতর এক মূল্যবান প্রয়াস—যার গুরুত্ব আজ আমরা অনেক বেশি অনুভব করতে পারছি।

২

জামতাড়া ও মধুপুরের মধ্যে ছোট্ট একটি জনপদ কার্মাটার বা কর্মটাঁড়। পলাশ ও শালের জঙ্গলে ঘেরা, ৬৫৯ ফুট উচ্চতার মনোরম পরিবেশ। এখানেই প্রায় আট একর জমির পূর্বদিক ঘেঁষে তিনি তৈরি করালেন একটি বাংলো বাড়ি—তার নাম দিলেন 'নন্দন কানন'। বাংলোর উত্তর দিকে ছিল প্রধান ফটক, তার পাশে নির্মিত তিনখানি ঘর মূলত অতিথি-অভ্যাগতদের জন্য, পশ্চিম দিক জুড়ে বিস্তীর্ণ বাগান। কেন এত বড়ো বাড়ি তৈরি করেছিলেন বিদ্যাসাগর? তার কারণ এই যে, আগে থেকেই তিনি মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে, তাঁর জমির সীমানার মধ্যেই তৈরি করবেন বিদ্যালয় যা ওই এলাকার প্রান্তিক মানুষের জীবনে বয়ে আনবে শিক্ষার আশীর্বাদ, তাদের ধূম্রধূসর জীবনে নিয়ে আসবে আলোকময় নতুন প্রভাত। মানবদরদি বিদ্যাসাগর তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণাকে কখনোই সামাজিক কাজের ঊর্ধ্বে স্থান দেননি, সে কারণে নাগরিক জীবনের শতেক ক্ষোভ ও অভিমান দূরে সরিয়ে রেখে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন প্রান্ত-মানুষের সেবায়, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে।

২০১১ সালের জনগণনা সমীক্ষা অনুসারে কর্মটাঁড়ে মোট ১,১৫,২৬৬ জন মানুষের মধ্যে অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল সাকুল্যে ৫৩,৮৪৪। এর অর্থ এই যে, শতকরা ৫৮.১৬ জন মানুষ এখনো সেখানে সাক্ষরতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বিদ্যাসাগরের সময়ে অশিক্ষার হার কী ভয়াবহ ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। ওই অঞ্চলের ভূমিপুত্র হল সাঁওতাল জনজাতি। সহজ-সরল সাঁওতাল আদিবাসীদের সংস্পর্শে এসে বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন তাদের হৃদয় অতি প্রশস্ত এবং নাগরিক জীবনের জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রকৃতির নির্মল সাহচর্যে বেড়ে ওঠা সেই মানুষগুলির উন্নতিবিধানের জন্য বিদ্যাসাগর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি বালিকাদের জন্য একটি স্কুল খুললেন এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয়। তাঁর নিজস্ব জমির ওপরেই গড়ে উঠল স্কুল দু-টি। অবৈতনিক বিদ্যালয় হিসাবে এই দু-টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মানুষজনের কাছে স্বপ্নময় এক জগতের দ্বার খুলে দিল।

বিদ্যাসাগর নিজেকে ক্রমশ প্রস্তুত করলেন নির্জনবাসের জন্য—যা কার্যত হয়ে উঠল তাঁর জীবনের গৌরবময় কর্ম-প্রণোদনের বিশেষ একটি অভিমুখ, নতুনতর এক মূল্যবান প্রয়াস—যার গুরুত্ব আজ আমরা অনেক বেশি অনুভব করতে পারছি।

উনিশ শতকের সাতের দশকে বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড)-এর একটি পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বিদ্যাসাগর যে অসাধারণ তৎপরতায় শিক্ষাবিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন তা বিস্ময়কর। কার্মাটার, বারমুণ্ডি, মোহনপুর, বড়দহ, দুমারিয়া, পোস্তা, কুরুয়া, বিরাজপুর, তেঁতুলবাঁধ প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ শিক্ষার আলোবাতাস থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন। কার্মাটার থেকে বারমুণ্ডির দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার, বিরাজপুর চার কিলোমিটার, পোস্তা ও কুরুয়া যথাক্রমে সাত ও আট কিলোমিটার। আমাদের রাজ্যের বর্ধমান জেলার (এখন পশ্চিম বর্ধমান জেলা) সালানপুর থেকে কার্মাটার বিশেষ দূরে নয়, মাঝে মাত্র দু'টি স্টেশন—ধানবাদ ও নিরসা, ট্রেনপথে

তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কোনো মনীষী প্রান্তিক মানুষের সামাজিক উন্নয়নের জন্য এমন নিবিড় আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেননি। অসাধারণ পৌরুষের শক্তিতে বিদ্যাসাগর সেই যুগে কার্মাটারে ২৪টি বিধবা বালিকার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কী সুউচ্চ বাধার পাহাড় পার হতে হয়েছিল তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

সময় লাগে আধঘণ্টা। এখানে বিদ্যাসাগর মেয়েদের জন্য স্কুল চালু করে তাঁর যুগপ্রবর্তনকারী 'স্ত্রীশিক্ষা প্রসার' কর্মসূচিকে বিস্তার করেছিলেন। কার্মাটারের সাধারণ মানুষজন হিন্দি, বাংলা ও সাঁওতালি ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। স্কুল চালানোর জন্য শিক্ষকমণ্ডলী নিয়োগ, বইপত্র কেনা ও অন্যান্য যাবতীয় খরচপত্র বিদ্যাসাগরকেই বহন করতে হয়েছিল, পর্দার অন্তরালে থাকা অসহায় মেয়েদের স্কুলে আনতে গিয়ে তাঁকে অনেক কাঠখড়ও পোড়াতে হয়েছিল কেননা হতভাগ্য এই দেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের মতো বালাই আর নেই। বিদ্যাসাগরের কাছে তা আদৌ অজানা ছিল না।

তবু পিছপা হননি বিদ্যাসাগর। মহৎ কোনো কাজে মাঝপথে পিছিয়ে আসা ধাতে ছিল না তাঁর। কেবলমাত্র নারীসমাজের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই নয়, কার্মাটার ও সংলগ্ন অঞ্চলে বাল্যবিবাহ রোধ ও বিধবাবিবাহ চালু করার জরুরি আন্দোলনও শুরু করেছিলেন তিনি। আদিবাসী সমাজে এই যে কর্মকাণ্ডের সূচনা করলেন তিনি—তার ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তাঁর আগে ভারতবর্ষে আর কোনো মনীষী প্রান্তিক মানুষের সামাজিক উন্নয়নের জন্য এমন নিবিড় আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসেননি। অসাধারণ পৌরুষের শক্তিতে বিদ্যাসাগর সেই যুগে কার্মাটারে ২৪টি বিধবা বালিকার পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কী সুউচ্চ বাধার পাহাড় পার হতে হয়েছিল তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। তিনি যে দূরদর্শিতা নিয়ে তাঁর প্রগতিভাবনাকে ভারতবর্ষীয় সমাজে বাস্তবায়িত করেছিলেন, এত কাল পরেও আমরা সেই মহান কর্মপ্রবাহে নিজেদের সাঙ্গীভূত করতে পারিনি। তাই গভীর বেদনায় তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে ২০০৩ সালের ২৫ আগাস্ট 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সময়োচিত প্রতিবেদনে সাংবাদিক গৌতম সরকার লিখেছিলেন, ''Vidyasagar had waged a battle to abolish child marriage and advocated widow remarriage among tribals in the village. However, two years ago a tribal boy was killed in Karmatar because he wished to marry a widow. The incident was shocking as 130 years ago, 24 child widows were remarried by Vidyasagar there''. এই প্রতিবেদনটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি আরো একবার ভেসে ওঠে মনের পর্দায়—''সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁর স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।''

৩

বিদ্যাসাগর লক্ষ করেছিলেন কার্মাটার ও সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষজনের স্বাস্থ্য পরিষেবা অত্যন্ত অবহেলিত। অপুষ্টিতে জীর্ণ অসহায় মানুষজনের অধিকাংশই ভুল চিকিৎসায় অথবা বিনা চিকিৎসায় মারা যান। ভয়াবহ এই পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে দরদি বিদ্যাসাগর তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে জনস্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করেছিলেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল, সে কারণে তিনি নিজেই গরিব মানুষজনের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রোগনির্ণয় শুরু করেন এবং বিনা পয়সায় ওষুধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীচরণ চক্রবর্তীর লেখা The Life of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar গ্রন্থের এই উক্তিটি এবিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। শ্রী চক্রবর্তী লিখেছেন, ''He had a good number of valuable homoeopath books, rare in Bengal in those days, purchased direct from England and he ardently read them and digested them. From 1877 he began to practice it himself''. বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না যে, কার্মাটারে গরিব আদিবাসীদের রোগযন্ত্রণায় ব্যথিত হয়েই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালু করেছিলেন। ১৮৭৭ সালটি চিকিৎসা পরিষেবায় তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগের পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা সেই সময়কালে তিনি কার্মাটারেই অবস্থান করছিলেন। তাঁর অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন, ''তিনি প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশঘটিকা পর্যন্ত সাঁওতাল রোগীদিগকে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিতেন এবং পথ্যের জন্য সাগু, বাতাসা, মিছরি প্রভৃতি নিজ হইতে প্রদান করিতেন।'' প্রান্তিক মানুষের জন্য এহেন অকৃত্রিম দরদ ও কল্যাণকর কর্ম-প্রণোদন কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই তৎকালীন সময়ে একপ্রকার দুর্লভ ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

বিদ্যাসাগর যে বিশেষ পরিকল্পনা করে কার্মাটারে প্রান্তিক মানুষের পক্ষে কাজগুলি করেছিলেন এমন নয় কিন্তু তাঁর মানবসেবার যৌক্তিক অভিমুখ প্রশস্ত হৃদয়ের মানুষটিকে প্রতিটি পদক্ষেপেই একান্ত ব্যতিক্রমী ও উদাহরণযোগ্য করে তুলেছিল। 'বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ দিনগুলি' নামের বইটিতে সন্তোষকুমার অধিকারী জানিয়েছেন—''তাঁর বাগানে ঢুকবার দরজার পাশে যে তিনটি ঘর ছিল, সেগুলিতে থাকতো দূরের গ্রাম থেকে আসা রোগীরা। যখনই প্রয়োজন হ'ত, তিনি নিজেই রোগীর বাড়ি চলে যেতেন। মেথরপল্লিতে সারারাত বসে কলেরা রোগের চিকিৎসা করেছেন, এমন ঘটনার কথা স্থানীয় সাঁওতালদের মুখে শোনা গেছে।'' একজন মানুষ কোন উচ্চতায় পৌঁছলে এমন নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবায় আত্মনিবেদন করতে পারেন তা ভাবতে বসলে বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

কার্মাটার-পর্বেও বিদ্যাসাগরকে কলকাতার সঙ্গে বিভিন্ন কারণে যোগাযোগ রক্ষা করতে হত। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের কাজকর্ম পর্যালোচনা করা, বাদুড়বাগানে নিজের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করে গ্রন্থাগারটি সেখানে নিয়ে আসা, 'কলিকাতা পুস্তকালয়' স্থাপন, নিজ-সম্পত্তির 'উইল' বা ইচ্ছাপত্র প্রণয়ন, একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মতামত জ্ঞাপন, সরকারি কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি নানা গুরুত্বপূর্ণ সূচি তাঁর প্রতিদিনের কাজের অন্তর্গত ছিল। তথাপি কার্মাটারের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত করে তিনি কখনোই কলকাতায় চলে আসেননি। প্রান্তিক মানুষের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও সীমাহীন দায়বদ্ধতা তাঁকে সর্বদাই যুক্ত রেখেছিল শিকড়ের গ্রন্থিবন্ধনে, মাটির কাছাকাছি থাকা অকৃত্রিম মানুষের সূত্র-সংযোগে। রোগীদের স্বার্থে তিনি জরুরি কাজ পিছিয়ে দিয়েছেন এমন উদাহরণও অজস্র। একবার রাজনারায়ণ বসুর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে তিনি লিখেছিলেন, ''আমি কল্য অথবা পরশ্ব আপনাকে দেখিতে যাইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এরূপ দুইটি রোগীর চিকিৎসা করিতেছি যে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোনো

বুঝতে আদৌ অসুবিধা হয় না যে, কার্মাটারে গরিব আদিবাসীদের রোগযন্ত্রণায় ব্যথিত হয়েই তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চালু করেছিলেন। ১৮৭৭ সালটি চিকিৎসা পরিষেবায় তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগের পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেননা সেই সময়কালে তিনি কার্মাটারেই অবস্থান করছিলেন।

তিনি জানতেন দয়ার দানে মানুষ অপমানিত হয়, তার হৃদয় ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি অতএব বন্ধুর মতোই আদিবাসী সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ও অবহেলিত নারীসমাজের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন।

মতে উচিত নহে।'' প্রান্তিক মানুষের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য নয়—অন্তর দিয়ে ভালোবাসা ও আপদে-বিপদে পাশে দাঁড়ানোর যে ব্রতপালন বিদ্যাসাগরের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল তা কার্যত বিস্ময়কর এক কর্মযজ্ঞে রূপান্তরিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় বিদ্যাসাগরের একটি ডায়েরি সংরক্ষিত রয়েছে। সেই ডায়েরিতে তাঁর কাছে চিকিৎসা করেছেন এমন অনেক রোগীর নাম দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও রোগের বিবরণ লেখা হয়েছে এবং কী ওষুধ দেওয়া হয়েছে, রোগী আরোগ্য হলেন কি না, তাও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৮০-১৮৮৩ সাল সময়কালে লেখা এই দিনপঞ্জি প্রমাণ করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর কতখানি সাবধানতা অবলম্বন করতেন। চিকিৎসার পাশাপাশি গরিব মানুষদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কথা ভেবে পথ্যের ব্যবস্থা এবং ক্ষেত্রবিশেষে দূরান্তের রোগীদের বিনা পয়সায় থাকার ব্যবস্থা করে তিনি জনকল্যাণে যে অগ্রণী চিন্তনের পরিচয় রেখে গেছেন তা আজো আমাদের বিস্মিত করে।

৪

বিদ্যাসাগর যে অনন্য দূরদর্শিতায় আদিবাসী সমাজের বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন তার তাৎপর্য আমরা এতদিন পরে হয়তো বা উপলব্ধি করতে পারি। জীবনে 'ভদ্রলোক' ঢের দেখেছিলেন তিনি, তিক্ত অভিজ্ঞতায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তাঁর হৃদয়, তাই সহজ ও অকৃত্রিম আদিবাসী সমাজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন বেঁচে থাকার অমেয় প্রেরণা। তিনি যে নিজের পয়সায় ভুট্টা কিনে সাঁওতাল বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করে আনন্দ পেতেন বা পরবের সময়ে সাধ্যমতো জামাকাপড় কিনে দিয়ে প্রসন্নতা লাভ করতেন, তার মধ্যে দয়া বা করুণার চিহ্নমাত্র ছিল না। মানুষ যেভাবে কাছের মানুষজনকে ভালোবাসে, উৎসব-অনুষ্ঠানে উপহার দেয়—বিদ্যাসাগরের মনোভাবও ছিল সেরকম। তিনি জানতেন দয়ার দানে মানুষ অপমানিত হয়, তার হৃদয় ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি অতএব বন্ধুর মতোই আদিবাসী সমাজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বয়স্কদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ও অবহেলিত নারীসমাজের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, ''হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা।'' রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন, ভারতবর্ষের দেশহিতৈষীর দল আত্মম্ভরিতার বশে লোকসমাজকে দূরে সরিয়ে রেখে, নেহাৎই দয়াপরবশ হয়ে লোকহিত করতে চেয়েছিলেন। এজন্য তাঁরা ব্যর্থও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা যদি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উদাহরণটি সামনে রাখতেন তবে বিলক্ষণ বুঝতে পারতেন, লোকহিত করতে হলে মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসা জরুরি, সাধারণের ক্লিষ্ট যাপনে সমূহ একাত্মতা গড়ে তোলা ছাড়া লোকসমাজের যথার্থ হিতসাধনের আর কোনো নির্ভরযোগ্য উপায় নেই।

সন্তোষকুমার অধিকারী তাঁর বইটিতে বিদ্যাসাগরের একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন যেখানে তিনি অভিরামকে নির্দেশ দিচ্ছেন—''এই পত্রের

মধ্যে ত্রিশ টাকার নোট পাঠাইতেছি, সকলকে দিবে। আমি যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অসুখ ও কাজের ঝঞ্ঝাট এই দুই কারণে যাইতে পারিতেছি না।'' চিঠির বয়ানটি পড়লেই বোঝা যায়, বিদ্যাসাগর যে তাঁর আদিবাসী ভাইবোনেদের জন্য অর্থ প্রেরণ করছেন তার মধ্যে 'আত্মাভিমানের মদ' নেই, উচ্চকিত ঘোষণা নেই। আর পাঁচটা গুরুত্বপূর্ণ কাজের মতোই এটি তাঁর একটি গুরুদায়িত্ব যা নিজের হাতে সম্পাদন করতে না পারার বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর চিঠিটিতে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জীবনের বর্ণময় অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন, ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ সত্যিকারের ভারতবর্ষ নয়। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র থেকে 'প্রবাসী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকা সুবিখ্যাত 'গোরা' উপন্যাসের ছাব্বিশ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোরার যে যুক্তিবিন্যস্ত অনুভবরাজি উপস্থাপন করেছেন তা যেন বিদ্যাসাগরেরই জীবনবেদ। শহর ছেড়ে গ্রামের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ পেয়ে গোরা উপলব্ধি করেছিল...''এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল—সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন—প্রত্যেক পাঁচ-সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত—পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত'' এবং ''এই অজ্ঞতা, জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে, প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না'' এবং এই দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে নতুন ভারত গড়ে তোলা অসম্ভব।

কার্মাটারে দীর্ঘ আঠারো বছরের জীবনকালে বিদ্যাসাগরের অন্তরলোকে যে অনুভব ডানা মেলেছিল তার সঙ্গে গোরার জীবনদর্শনের মিল খুঁজে পাই। তিনি দেশের প্রান্তিক মানুষের সমতলে নেমে আসতে পেরেছিলেন বলেই তাদের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় সঞ্জীবিত হয়েছিলেন। তিনিই সম্ভবত এই মহাদেশের প্রথম মানুষ যিনি আদিবাসীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও পশ্চাদপদ জনজাতিকে স্বাবলম্বী করার জন্য সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও নিজস্ব ভাবভাবনায় একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। সন্তোষকুমার অধিকারী লিখেছেন, ''সাঁওতাল কপটতা জানে না; রাজনীতি শেখেনি। তাই আজও (গত শতাব্দের আটের দশকের প্রথম ভাগ) অভিরাম মণ্ডলের পৌত্র নাথুরাম ভাঙা বেদির মূলে ফুল দিয়ে প্রতিদিন প্রণাম করে। কারণ তাদের কাছে বিদ্যাসাগর ছিলেন দেবতা।''

তিনিই সম্ভবত এই মহাদেশের প্রথম মানুষ যিনি আদিবাসীদের কল্যাণ ও উন্নয়নের কাজে নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগ করেছিলেন ও পশ্চাদপদ জনজাতিকে স্বাবলম্বী করার জন্য সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ও নিজস্ব ভাবভাবনায় একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন।

দেবতা হতে চাননি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামের বরেণ্য মানুষটি। দেব-দ্বিজে, শুভ-অশুভ সংস্কারে, আচার-বিচারে আস্থা ছিল না তাঁর। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস রাখতেন মানবতার বিনিদ্র প্রহরে, গণমানুষের জন্য স্বার্থহীন কর্মযজ্ঞের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে। আজ দিকে দিকে প্রান্তিক মানুষের কল্যাণে নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। সেই বাস্তবতার নিরিখে, অতীতের ফিরে তাকালে, প্রায় দেড়শো বছর আগে বিদ্যাসাগর কার্মাটারে যে সুমহান কর্মধারার সূচনা করেছিলেন তা আজো সর্বস্তরের মানুষকে যুগপৎ বিস্মিত ও শ্রদ্ধাবনত করে—সেই জরুরি কথাটি সবিনয়ে উল্লেখ না করলে ইতিহাসের অমর্যাদা করা হবে।

# শৈশবের মেঘদূত
# ভাষাসাগর বিদ্যাসাগর

রাতুল দত্ত

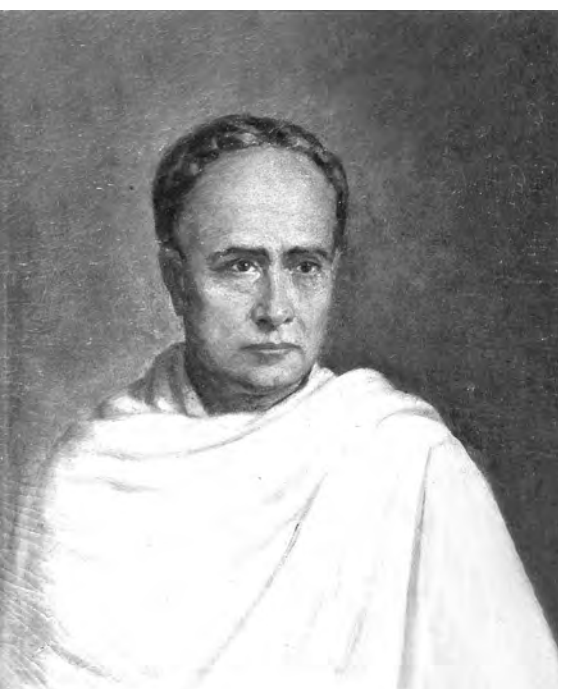

রবি কবির ভাবনা এবং বক্তব্যের বাইরে পেরিয়ে এসে কিছু বলার বা ভাবার সাহস বোধহয় বাঙালির এখনও হয়নি। এতটা সাবালক বোধহয় বাঙালি আগামী ৫০ বছরেও হতে পারবে না। আর হয়ত দরকারও নেই। তাই যে রসসাগর-করুণাসাগর-ভাষাসাগরকে নিয়ে আমাদের বিশ্লেষণের চেষ্টা, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বোধহয় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার সম্ভব। তিনি তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত' গ্রন্থের এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ১৪) লিখছেন, 'বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেখানে দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন!' আবার তিনি আর এক জায়গায় (পৃষ্ঠা ৫০) প্রাণ খুলে বিদ্যাসাগর স্তুতি করতে গিয়ে লিখছেন, 'আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্চরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়িয়া যায়—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন'।

আর এই মানুষ করার ভার যদি সত্যিই কেউ নিজের কাঁধে তুলে নেন, তাঁকে শিশুর শৈশবের দায়িত্বভার নিতেই হবে। একজন মানুষ, একজন বাঙালি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২০০ বছর আগে। কিন্তু তিনি বাঙালি শিশুর শৈশব সম্পর্কে এতটা কি আধুনিক-মনস্ক এক ভাষাবিজ্ঞানীর পরিচয় দিলেন, যাতে আজ 'বর্ণপরিচয়' এবং 'বিদ্যাসাগর' এই দুটি শব্দ সমর্থক হয়ে যায়! শুধু বর্ণপরিচয় কেন? বর্ণপরিচয়ের দুটি ভাগ-সহ কথামালা, বোধোদয়, নীতিবোধ—বলা যায়, সেদিন এই বইগুলিই ছিল প্রায় ৫০ বছর ধরে শিশুপাঠ্য বইয়ের 'বেস্ট সেলার'। রবীন্দ্রনাথ তাই নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন, 'জল পড়ে/পাতা নড়ে', আমার জীবনে এইটেই প্রথম কবিতা।

কিন্তু বিদ্যাসাগর কেন লিখলেন বর্ণপরিচয়? বাঙালির বর্ণজ্ঞান কী এর আগে ছিল না? শিশুপাঠ্য বই লেখার দিকে নিজের মেধাবৃত্তি কেন ব্যয় করতে গেলেন বিদ্যাসাগর—তা বুঝতে গেলে পৌঁছে যেতে হবে ২০০ বছরেরও আরও কিছু সময় আগে। সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের জন্মগ্রহণের, বাংলাভাষার প্রয়োজনে।

## প্রেক্ষাপট

বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন খ্রিস্টান মিশনারির ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। কোম্পানি যখন ভারতে আস্তে আস্তে তাদের রাজস্ব কায়েম করতে চাইছে, তখন সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা এসেছিল পর্তুগিজ, ডাচ এবং ফরাসিদের থেকে। কারণ, সে-সময় মোগল সাম্রাজ্যের

শেষদিকে ভারতে অন্যতম নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য সমুদ্রপথের ব্যবসায়ী ছিলেন তাঁরাই, ইংরেজরা নন। তখনও পর্যন্ত কোম্পানির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মিশনারিদের পক্ষে বাংলার আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থান এবং তাদের শিক্ষাগত চাহিদা বোঝা সম্ভব হয়নি। ফলে কোম্পানির ইতিহাসের প্রথমদিকে বাংলা তথা ভারতে নানা ধরনের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই ছিল খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা।

বিভিন্ন মিশনারির সদস্য এবং কোম্পানির কর্মচারিরা এর ফলে দ্রুত বাংলা-সহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা শিখতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, কিন্তু ভাষাশিক্ষা নয়। বরং, আঞ্চলিক ভাষা শিখে যোগসূত্র স্থাপন করে, আঞ্চলিক মানুষদের মধ্যে বাইবেল ও খ্রিস্টান ধর্মের নানা দিক তুলে ধরা। ফলে শ্রীরামপুর মিশনারিজ-এর একটি উদ্দেশ্য যেমন ছিল ভারতীয়দের আরও খানিকটা এগিয়ে দেওয়া এবং অন্য উদ্দেশ্য ছিল— বাইবেলের প্রচার।

ঠিক এই সময়েই যেন সঠিকভাবে বাংলার বুকে বাংলা ভাষাশিক্ষায় নবজাগরণ ঘটাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন 'পণ্ডিত'। অর্থাৎ টোল বা চতুষ্পাঠীর দীর্ঘসূত্রী শিক্ষায় তিনি বড়ো হয়েছিলেন। সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অবশ্যই কাম্য, পণ্ডিত বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু টোলের প্রাচীন পন্থায় সংস্কৃত শেখার গুরুবিদ্যা দিয়ে যে বাঙালি বেশিদূর দৌড়োতে পারবে না, সেটাও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি। 'বর্ণপরিচয়'-এর জন্ম সেই ভাবনা থেকেই। একদিকে মিশনারিজের শিক্ষার দৌলতে ইংরেজি শেখার প্রবল চাপ, অন্যদিকে সংস্কৃত শেখার দীর্ঘসূত্রিতা এবং সেজন্য ক্রমশ বাংলা শেখার অনীহা—

ব্যপটিস্ট মিশন প্রেস

জেমস লং (ওপরে) ও তাঁর বই (নীচে)

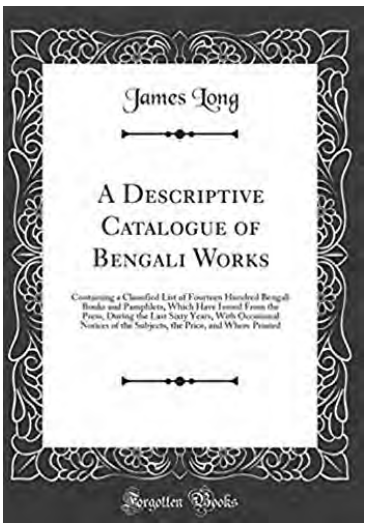

রাধাকান্ত দেব

এই দুয়ের প্রেক্ষাপটেই লেখা হল 'বর্ণপরিচয়'। এই বইয়ের আগে-পরে বাঙালি শিশু হাতে পেল 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'চরিতাবলী' এবং 'আখ্যানমঞ্জরী'। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'বর্ণপরিচয়'। কারণ একদিকে বর্ণপরিচয়ে রয়েছে বাংলা শেখার সোপান, অন্যদিকে শিশুদের জীবনে কীভাবে চলতে হবে—তার শিক্ষাগ্রন্থও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়। বলা যায়, বর্ণপরিচয় হল অভিভাবকদের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বই।

কিন্তু ছোটোদের জন্য একের পর এক বই কেন? তা-ও আবার এক্কেবারে ভাষা শেখার সূচনালগ্নের থেকে শুরু করে নীতিজ্ঞানের বুনিয়াদ গড়ে তোলার ভাবনা কেন? কারণ, আজ যেভাবে শিশুপাঠ্য বই সুলভে মেলে, সেদিন তেমন অবস্থা ছিল না। এই বইগুলি পড়লে ফুটে উঠবে ছবি, মনে জাগবে কবিতা, হবে হাতে-কলমে শিক্ষা—এই ছিল স্বপ্ন এবং সেটি সম্পূর্ণ সফল।

## বর্ণপরিচয়-পূর্ববর্তী শিশুপাঠ্য

জেমস লং ১৮৫৫ সালে একটি ক্যাটালগ তৈরি করেছিলেন (A Descriptive Catalogue of Bengali Works by J. Long, 1855), যার মধ্যে বেশ কয়েকটি শিশুপাঠ্য বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। লং সাহেব ইংরেজিতেই বইগুলির উল্লেখ করেছিলেন, বাংলায় নয়। প্রতিটি বই ঘাঁটলে বোঝা যাবে, ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এবং বাংলায় বর্ণশিক্ষার কোন প্রাথমিক অবস্থায় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর একের পর এক শিশুপাঠ্য বই লেখায় তাগিদ অনুভব করেছিলেন। সঙ্গে বুঝতে হবে, তিনি এই বইগুলি এতটাই সময়োপযোগী—আধুনিক-বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখেছিলেন যে, আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

১৮১৬ সালে লেখা হয়েছিল 'লিপিধারা'। লেখকের নাম জানা যায় না। পৃষ্ঠা ছিল মোট ১২টি। এখানে বাংলা বর্ণগুলি সাজানো ছিল তাদের আকৃতি অনুসারে। যেমন, ত্রিকোণ বা ত্রিভুজ আকারের সমস্ত বর্ণকে একসঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এরপর ছিল গোলাকৃতি বর্ণের মালা। সেগুলিকে একসঙ্গে লেখা হত। এরকমভাবে প্রায় ৭৬০টি যুক্ত এবং অযুক্ত বর্ণের উল্লেখ প্রাক্-বর্ণপরিচয় যুগের লিপিধারা বইতে পাওয়া যায়।

এরপর বর্ণপরিচয়ের আগে আরও দুটি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি হল ১৮২০ সালে প্রকাশিত এবং রাধাকান্ত দেবের লেখা 'বানান বই' (Spelling Book) এবং অন্যটি তাঁরই লেখা 'বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ'। অনেকে বলেন, এই দুটি আদপে একই বই। তবে পৃষ্ঠাসংখ্যা আলাদা হওয়ায় জটিলতা রয়েছে। প্রথম বইতে পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৫৬ এবং দ্বিতীয় বইতে ২৮৮, এই বইগুলিতে শুধু বাংলা বর্ণমালা নয়, এবং সাধারণ জ্ঞানের উপযোগী বিজ্ঞান-ভূগোল-অঙ্ক-ইতিহাস এবং ব্যাকরণ নিয়ে অনেক কিছু লেখা হয়েছিল।

এরপর পাওয়া যায় আরও একটি বই 'বঙ্গ বর্ণমালা'। এটি অনেকটা বর্ণপরিচয়ের স্টাইলে লেখা। দামও ছিল ১ আনা এবং পৃষ্ঠা ২৪, বানান শিক্ষার এই বইয়ের লেখক কে ছিলেন, জানা যায় না। তবে জেমস লং-এর বইয়ের তালিকায় এই বইটির উল্লেখ ছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভার পক্ষ থেকে ১৮৪৪ সালে আরও একটি বানান এবং ভাষাশিক্ষার বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাম ঠিক জানা যায় না। খুবই পাতলা চটি বই। পৃষ্ঠাসংখ্যাও কম, মাত্র ১৩ পৃষ্ঠা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে সময় শিশু-কিশোরদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে Council of Education-কে লিখছেন—"What we require is to extend the benefit of education to the mass of the people. Let us establish a number of vernaculer schools, let us prepare a series of vernaculer classbooks on useful and instructive subjects, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished." অর্থাৎ বলা যায়, ১৮০০ সালে লর্ড ওয়েলেসলির হাত ধরে যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সূচনা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর তা টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

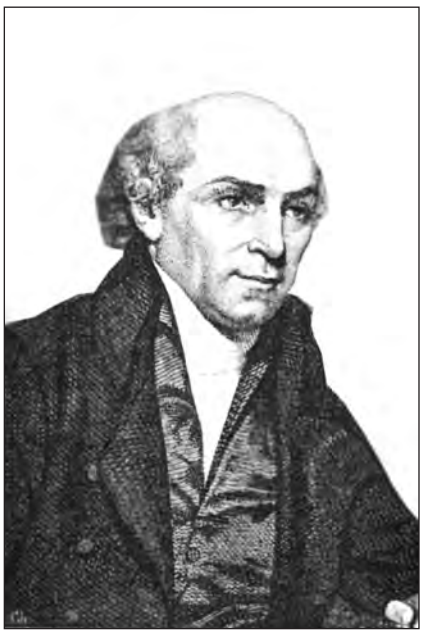

উইলিয়াম কেরী

রাজা রামমোহন রায়ের গদ্যের নিজস্ব স্টাইলের কথা বাদ দিলে, বাঙালি শিশুর হাতে 'বর্ণপরিচয়' আসার আগে সেই ভাষার কী করুণ পরিণতি হয়েছিল, তা অনেকটা বোঝা যায় ১৮০১ সালের 'প্রতাপাদিত্য চরিত' বইটি পড়লে। লিখেছিলেন উইলিয়াম কেরী সাহেবের মুন্সি রামরাম বসু। সে সময় বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান কেরী সাহেব ৫৯ জন পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। যা করার একাই করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্য পণ্ডিতদের লেখা শিশুপাঠ্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) ও প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮১৩), গোলকদাস শর্মার হিতোপদেশ (১৮০২), তারিণীচরণ মিত্রের ওরিয়েন্টাল ফ্যাবুলিস্ট (১৮০৩), চণ্ডিচরণ মুন্সির তোতা ইতিহাস (১৮০৫), হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫) এবং কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পদার্থ কৌমুদী (১৮২১)। এর সঙ্গে ছিল রামমোহনের পণ্ডিতি ধরনের গদ্য। ফলে শিশুদের বর্ণমালা—যুক্তাক্ষর এবং অযুক্তাক্ষর শেখার আদর্শতম বই হিসেবে 'বর্ণপরিচয়' ছাপার আগে তেমন কোনও আকর্ষণীয় বই ছিল না।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

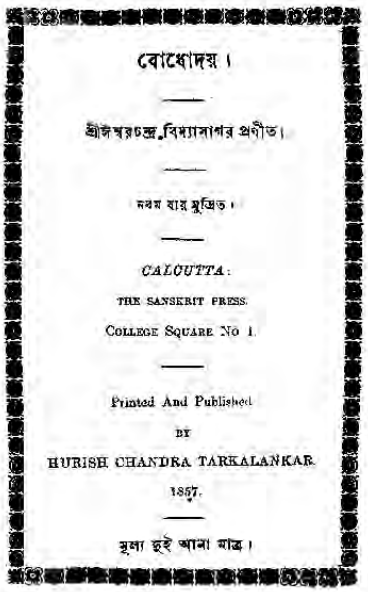

বোধোদয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

নবম বার মুদ্রিত।

CALCUTTA:
THE SANSKRIT PRESS.
COLLEGE SQUARE NO 1.

Printed And Published
BY
HURISH CHANDRA TARKALANKAR.
1857.

মূল্য দুই আনা মাত্র।

বর্ণপরিচয়-পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে যে আরও ৪টি বই উল্লেখযোগ্য ছিল—সেগুলি হল কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', বিদ্যাসাগর মশাইয়ের নিজের লেখা 'বোধোদয়', বিদ্যাসাগরের সুহৃদ বন্ধু অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ' এবং অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির লেখা 'শিশুবোধক'। প্রাক্ বর্ণপরিচয় সময়ের শিশুপাঠ্য বিশ্লেষণে এদের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, এখনও পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষার ৩টি উল্লেখযোগ্য বইও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র লিখে ফেলেছেন। এই ৩টি বই হল—সংস্কৃত ব্যাকরণ উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী এবং ঋজুপাঠ। সংস্কৃত ব্যাকরণের বই দুটি উল্লেখের কারণ হল—বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য বর্ণপরিচয় লেখার নেপথ্যে কাজ করেছে। পরিস্কার বোঝা যায়, পরিণত বিচার-বিশ্লেষণ বুদ্ধি, পাকা হাত এবং পাকা মাথা নিয়েই তিনি বর্ণপরিচয় লিখতে নেমেছিলেন।

প্রথমে আসা যাক, 'বোধোদয়'-এর প্রসঙ্গে। ১৮৫১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়'। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত ১০৬টি সংস্করণ ছাপা হয়। এর মধ্যে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ৬ বছরে ১৪,০০০ কপি ছাপা হয়। তখনকার দিনের বেথুন স্কুলের মেয়েদের শিক্ষার জন্য লেখা এই বই। চেম্বারস প্রকাশিত 'Rudiments of Knowledge'-এর বাংলা সংস্করণ এই বই—এটা বলা যেতেই পারে। বইয়ের প্রথম সংস্করণে বিদ্যাসাগর লিখছেন—"Bodhodaya is a compilation from several English books and not a translation of a particular book;"

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থের লেখক ছিলেন কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তবে এই বইটি প্রকাশে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছিলেন বেথুন সাহেব, ইংরেজদের ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। সেদিনের বেথুন স্কুল ও কলেজ তারই পরিণতি এবং এই স্কুলের মেয়েদের প্রথম পাঠ্যক্রমের ভাবনা থেকেই 'শিশুশিক্ষা' লিখেছিলেন মদনমোহন। বেথুন সাহেব এই বইটি ছাপাতে সাহায্য করেছিলেন বলে লেখক বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন। 'বর্ণপরিচয়-এর মতো 'শিশুশিক্ষা'-রও ছিল প্রথম ভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগ। প্রথম ভাগে ছিল অসংযুক্ত বর্ণ এবং দ্বিতীয় ভাগ ছিল সংযুক্ত বর্ণ। বলা যায়, দীর্ঘদিনের শুভানুধ্যায়ী এবং সুহৃদ বন্ধু মদনমোহনের বইটি বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় লেখার কাঠামো তৈরিতে ভীষণ সাহায্য করেছিল। প্রথম ৬ বছর এই বইটির ১০টি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। 'শিশুশিক্ষা'-র চতুর্থ ভাগই হল 'বোধোদয়'—এটাও অনেকে বলে থাকেন। ফলে দুই লেখক মদনমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মধ্যে যে হৃদ্যতা ছিল এবং তার জন্যই নিজে বন্ধুর লেখা বইয়ের চতুর্থ ভাগ লেখা ও প্রকাশনার দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে, সে কথা বলা বাহুল্য।

সেসময় কলকাতার ৪০, গরাণহাটা স্ট্রিটের অক্ষয় লাইব্রেরি থেকে পূর্ণচন্দ্র শীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হত 'শিশুবোধক' বইটি। দাম ছিল ১২ আনা। কী থাকত এই বইতে? স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, নানা ধরনের যুক্তাক্ষর, বানান, নাম-ঠিকানা সহ চিঠি লেখার পদ্ধতি, শতক-কড়া-গন্ডা ইত্যাদি পরিমাপের গণনা পদ্ধতি ও তার উদাহরণ, তখনকার দিনে বাজারের নানা ওজন পদ্ধতি ও তার একক, সময় পরিমাপক পদ্ধতি, ভূমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-ক্ষেত্রফল মাপার পদ্ধতি, সুদকষা, মাসিক খরচের হিসেব লেখার পদ্ধতি, নানা ধরনের গুণের নামতা ইত্যাদি। এছাড়া ছিল

১০৫টি চাণক্য শ্লোক। ছিল ছন্দোবদ্ধ কয়েকটি সহজ পাঠের কবিতা যেমন—কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'গঙ্গার বন্দনা', দ্বিজ কবিচন্দ্রের 'দাতাকর্ণ ও কলঙ্কভঞ্জন', কোনও অজ্ঞাত লেখকের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এবং অযোধ্যারামের 'গুরুদক্ষিণা'। তবে সবকিছুর পরও 'শিশুবোধক' বইটিকে কখনোই বর্ণ-পরিচয়ের গ্রন্থ বলা চলে না। বরং সংকলন গ্রন্থ বলা চলে। সেই সঙ্গে 'শিশুশিক্ষা' বা 'শিশুবোধক—দুটি বইয়ের কোনোটিই এত জনপ্রিয় হতে পারেনি। কারণ বর্ণপরিচয় লেখা হয়েছিল, সংস্কৃত থেকে নির্যাস বের করে আধুনিক বাংলার নিরিখে। কটি স্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ থাকা উচিত, তা আর কেউ ভাবেননি। ফলে বর্ণপরিচয় পূর্ববর্তী বইগুলিকে অনেকটাই স্মারক বা সংকলক গ্রন্থ বলা চলে।

সংস্কৃত হলেও একটু অন্য ধরনের বই ছিল 'ঋজুপাঠ', প্রথম ভাগ (১৮৫১), দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ (১৮৫২)। প্রথম ভাগে রয়েছে পঞ্চতন্ত্র ও মহাভারতের গল্প, দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড এবং তৃতীয় ভাগে হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ, ঋতুসংহার, বেণীসংহার এবং মহাভারত।

সুতরাং এই সবকটি বই ছিল অবশ্যই শিশুপাঠ্য এবং 'বর্ণপরিচয়' লিখতে শুরু করার আগে এই বইগুলিই ছিল লেখার ভিত্তিভূমি—বলাই যায়।

## ৭টি বৈশিষ্ট্যে অনন্য বর্ণপরিচয়

**(ক)** আধুনিক বর্ণমালার মূল রূপকার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বহুদিন পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালায় ১৬টি স্বরবর্ণ এবং ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ অর্থাৎ মোট ৫০টি বর্ণ ছিল। সংস্কৃতে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেটিকে ১২টি স্বরবর্ণে কমিয়ে আনলেন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ বেড়ে হল ৪০টি। যে ৪টি স্বরবর্ণ কমল সেগুলি হল—

**ঋ (দীর্ঘ), ঌ (দীর্ঘ), ং (অনুস্বর), ঃ (বিসর্গ)**

যে ৬টি ব্যঞ্জনবর্ণ বাড়ল সেগুলি হল—

**ং, ঃ, ঁ এবং ড়, ঢ়, য়**

এবং যেটি ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে কমে গেল সেটি—

**ক+ষ=ক্ষ**

বর্ণপরিচয়ের বিজ্ঞাপনে স্বয়ং শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর) নিজে বর্ণমালা নিয়ে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন—'দীর্ঘ ঋ-কার' এবং 'দীর্ঘ ঌ কার'- এর প্রয়োগ বহুদিন আগেই বাংলায় বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সেগুলি কমিয়ে দেওয়া উচিত। অন্যদিকে 'ং' এবং 'ঃ' কখনোই স্বরবর্ণ হতে পারে না। তাঁর মতে, 'ঁ' অবশ্যই স্বতন্ত্র একটি বর্ণ এবং সেটি ব্যঞ্জনবর্ণ। 'ক' ও 'ষ' মিলে যেহেতু 'ক্ষ' তৈরি হচ্ছে, ফলে সেটি যুক্তবর্ণ, অযুক্ত বর্ণ নয়। আবার 'ড', 'ঢ', 'য' যদি শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকে, সেটি পরিবর্তিত হয়ে 'ড়', 'ঢ়', 'য়' হয়ে যায়। এদের উচ্চারণও আলাদা হয়। ফলে আলাদা ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে ভাবাই ভাল।

বহুদিন পর্যন্ত বাংলা বর্ণমালায় ১৬টি স্বরবর্ণ এবং ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ অর্থাৎ মোট ৫০টি বর্ণ ছিল। সংস্কৃতে পণ্ডিত বিদ্যাসাগর সেটিকে ১২টি স্বরবর্ণে কমিয়ে আনলেন এবং ব্যঞ্জনবর্ণ বেড়ে হল ৪০টি।

বর্ণপরিচয়

প্রথম ভাগ

—০—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

রিসিভারের সংস্করণ।

প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটির প্রাঃ লিঃ
২১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

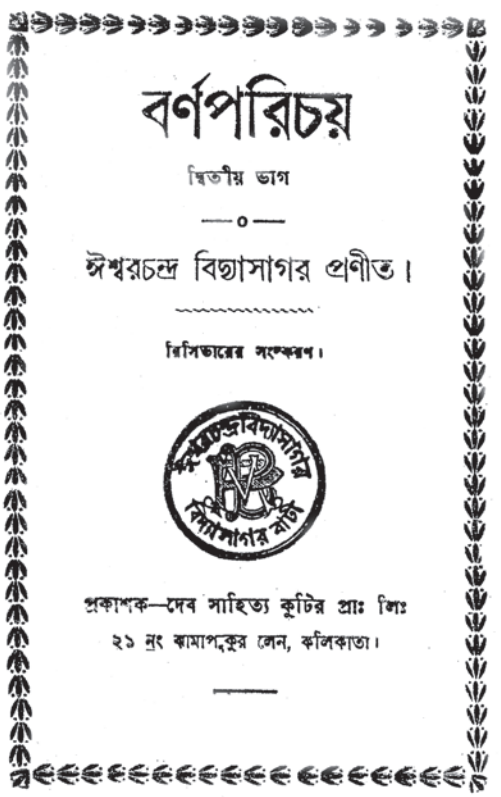
বর্ণপরিচয়

দ্বিতীয় ভাগ

—০—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত।

রিসিভারের সংস্করণ।

প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটির প্রাঃ লিঃ
২১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

**(খ)** বর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর বাংলায় যথাসম্ভব বেশি করে 'দাঁড়ি' অর্থাৎ যতিচিহ্নের ব্যবহার বাড়িয়ে দিলেন। এর আগে রামমোহনের গদ্যে এত বেশি যতি চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়নি। প্রথম ভাগের ১৪ এবং ১৫ নম্বর পাঠ থেকে দেখা যায় যতিচিহ্নের সুন্দর ব্যবহার। যেমন—

বেলা হইল। পড়িতে চল। আমার কাপড় পরা হইয়াছে।
তুমি কাপড় পর। আমার বই লইয়াছি।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন—'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই সংস্কারকামী মনের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার বিরাম-চিহ্নের প্রয়োগের ক্রমবাহুল্য দেখিয়া।'

**(গ)** বর্ণপরিচয় শুধু বর্ণের পরিচয় তৈরির জন্য বিশেষ একটি বই—এমনটি নয়। বরং বর্ণপরিচয় হল শিশুদের জন্য বিশেষ এক মৌলিক সাহিত্য। ছোটো ছোটো বাক্য। সঙ্গে ছবি ও ছন্দ। বিদ্যাসাগর যেন সেই অর্থে বাংলার আদি কবি, যাঁর কবিতা ও বর্ণ পরিচিতির শিক্ষা গ্রহণ করে বড় হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের পাঠ সম্পর্কে বিশ্বকবি লিখছেন, 'জল পড়ে/ পাতা নড়ে'—যেন তাঁর শৈশবের মেঘদূত। অন্যদিকে এটি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে কিছু প্রশ্ন রয়েছে। যেমন—আসল বর্ণপরিচয়ে কিন্তু রয়েছে—'জল পড়ে/মেঘ ডাকে'। আবার বরং অষ্টম পাঠে রয়েছে—'জল পড়িতেছে/পাতা নড়িতেছে।' অর্থাৎ বর্ষাকালের একটা সুন্দর তুলির টান এবং ছন্দ রয়ে গেছে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের কয়েকটি পাঠে।

বাংলা গদ্যসাহিত্য আরও অনেকেই লিখেছেন এবং লিখছেন। কিন্তু বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের—

২ পাঠ। হাত ধর। বাড়ি যাও।
৪ পাঠ। ধীরে চল। কাছে এস।
৫ পাঠ। নূতন ঘটী। পুরাণ বাটী।

—এর ছন্দ যেন বাংলা গদ্যের অন্তর্নিহিত ঝংকারের সম্ভাবনাকে আবার জাগিয়ে তুলল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'গদ্যের পদে এক ধ্বনি সামঞ্জস্য।'

**(ঘ)** চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, বিদ্যাসাগর তাঁর রচনায় কোনও বইয়েই ধর্মীয় একটি শব্দও আনেননি। নেই কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ বা ধর্মীয় সংস্রব। বরং তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন নীতিশিক্ষার এবং চরিত্র গঠনের ওপর। আজকের বিদ্যাসাগর-বিশেষজ্ঞরা এই ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার মানসিক প্রতিফলন দেখে আপ্লুত।

**(ঙ)** বর্ণপরিচয়ের অপর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, শিশুশিক্ষার সঙ্গে এটি অভিভাবক শিক্ষারও বই। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম নীতিগল্পও বললেন তিনি। আজও যখন স্কুল-কলেজের কোনও ছাত্র-ছাত্রী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রজন্ম চুরির দায়ে ধরা পড়ে, মনে পড়ে যায় 'ভুবনের মাসী'-র কথা। বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের ১০ম পাঠ তাই শিশুপাঠ্য কম, অভিভাবকদের পাঠ্য বেশি।

একটু বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে দেখলে কী বোঝা যাবে? প্রথম থেকে অষ্টম পাঠে তিনি দিলেন প্রকৃতির শিক্ষা। 'লাল ফুল', 'ছোট পাতা', 'পাখি উড়িতেছে', 'পাতা নড়িতেছে' ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি অভিভাবকদের যেন বলতে চাইছেন, শিশুকে প্রকৃতির কাছে নিয়ে যাও। প্রকৃতি দেখতে দেখতে শিশুর বয়স বাড়ুক। নবম থেকে পঞ্চদশ পাঠে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা দিলেন, একজন শিশুর রোজনামচা কেমন হওয়া উচিত। 'যাদব এখনও শুইয়া আছে', 'রাখাল সারাদিন খেলা করে', 'কাল আমরা পড়িতে যাই নাই', 'কাহাকেও গালি দিও না', 'সারাদিন খেলা করিও না', 'তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, পড়িয়া যাইবে', 'পড়া বলিতে না পারিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন, নূতন পড়া দিবেন না'—ইত্যাদি এক-একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যে সুন্দর ঘটনার মাধ্যমে নীতিশিক্ষা ছাড়া আর কী? ক্রমে বুঝলেন, লেখার মাধ্যমে শিশুশিক্ষার বয়স হয়েছে। ১৬-২০তম পাঠে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন পরিচয়ের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দিলেন তিনি। গোপাল, গিরিশ, রহিম, রাম, রাখাল ইত্যাদি চরিত্রের মাধ্যমে ছোটো ছোটো গল্প—যুক্তাক্ষর নেই—আশপাশের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় ঘটাচ্ছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পাঠ থেকেই নীতিশিক্ষা এবং জীবনে চলার পথের হদিশ দিচ্ছেন বিদ্যাসাগর। সেই সঙ্গে শেখাচ্ছেন যুক্তাক্ষরযুক্ত শব্দ। তৃতীয় পাঠ থেকে প্রতিটি পাঠ আবার এক-একটি চরিত্রের নামে। চরিত্র গুলি হল—যাদব, নবীন, মাধব, রাম, সুরেন্দ্র এবং ভুবন। শেষে দশম পাঠে এসে 'ভুবন চোর ও তার মাসী'-র যে গল্প উপহার দিলেন, আজকের ক'জন বাঙালি ছেলেমেয়ে বা তাদের অভিভাবকরা মনে করে রেখেছেন? সমাজ সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, ভাষা সংস্কার-এর সাথে গল্পকার বিদ্যাসাগর, নীতিবাগীশ বিদ্যাসাগর ফুটে ওঠেন বর্ণপরিচয়ে।

কখনও মিছা কথা কহিও না।
কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না।
কাহাকেও গালি দিও না।
ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না।
রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।
পড়িবার সময় গোল করিও না।
সারা দিন খেলা করিও না।

**বর্ণপরিচয়। প্রথম ভাগ। ১২ পাঠ।**

এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল; এবং, জোরে কামড়াইয়া, দাঁত দিয়া তাঁহার একটি কান কাটিয়া লইল; পরে সে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, মাসী, তুমিই আমার এ ফাঁসির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে, আমার এ দশা ঘটিত না। তাহা কর নাই, এজন্য এই পুরস্কার।

**বর্ণপরিচয়। দ্বিতীয় ভাগ। ১০ পাঠ।**

**(চ)** বর্ণ পরিচয় শুধু হলেই তো হবে না! কীভাবে বর্ণের পরিচয় ঘটাতে হবে, সেটিও বর্ণপরিচয়ে লিখে গেলেন বিদ্যাসাগর। কীভাবে উচ্চারণ করতে হবে, সেটিও রয়েছে বর্ণপরিচয়েই। কার্মাটার থেকে এই বইয়ের ৬০তম সংস্করণ যখন তিনি বের করছেন, তার বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র লিখছেন—বালকেরা অ, আ এই দুই বর্ণকে উচ্চারণের সময় স্বরের অ, স্বরের আ বলে থাকে। এভাবে না শিখিয়ে সরাসরি অ, আ শেখানো আবশ্যক।

এছাড়া যে-সব শব্দের শেষ বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ—এই স্বরবর্ণ নেই, তাদের উচ্চারণের পার্থক্য প্রথম শেখা গেল বর্ণপরিচয়ে। প্রথম ভাগের বর্ণযোজনা অংশের প্রতিটি পাতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় কিছু শব্দের পাশে '*' চিহ্ন দিয়েছিলেন। বাকি শব্দ '*' বিহীন। যে শব্দের শেষে '*' চিহ্ন নেই, সেগুলি হসন্ত উচ্চারিত হবে। যেগুলির পাশে '*' চিহ্ন রয়েছে, সেগুলি অ-কারান্ত উচ্চারিত হবে। (ছবি নীচে দ্রষ্টব্য)

আবার বাংলায় রয়েছে দুই ধরনের 'ত'। 'ৎ' এবং 'ত'। কোন শব্দের সঙ্গে কোন 'ত' ব্যবহার হবে, তা বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের শেষের দিকে উল্লেখ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে রয়েছে যুক্তাক্ষর। বিশেষ করে য ফলা (্য), র ফলা (্র), ল-ফলা (্ল), ব-ফলা (্ব)-র উচ্চারণ এবং ব্যবহার এবং বহু নতুন শব্দ শিখছে বাংলার শিশুরা। তৃতীয় পাঠে রয়েছে ণ-ফলা (ণ), ন-ফলা (ন), ম-ফলা (ম)। চতুর্থ পাঠে রয়েছে রেফ (র্)। পঞ্চম পাঠ থেকে দুই এবং তিন অক্ষরের মিশ্র সংযোগ।

বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে রয়েছে যুক্তাক্ষর। বিশেষ করে য ফলা (্য), র ফলা (্র), ল-ফলা (্ল), ব-ফলা (্ব)-র উচ্চারণ এবং ব্যবহার এবং বহু নতুন শব্দ শিখছে বাংলার শিশুরা। তৃতীয় পাঠে রয়েছে ণ-ফলা (ণ), ন-ফলা (ন), ম-ফলা (ম)। চতুর্থ পাঠে রয়েছে রেফ (র্)। পঞ্চম পাঠ থেকে দুই এবং তিন অক্ষরের মিশ্র সংযোগ।

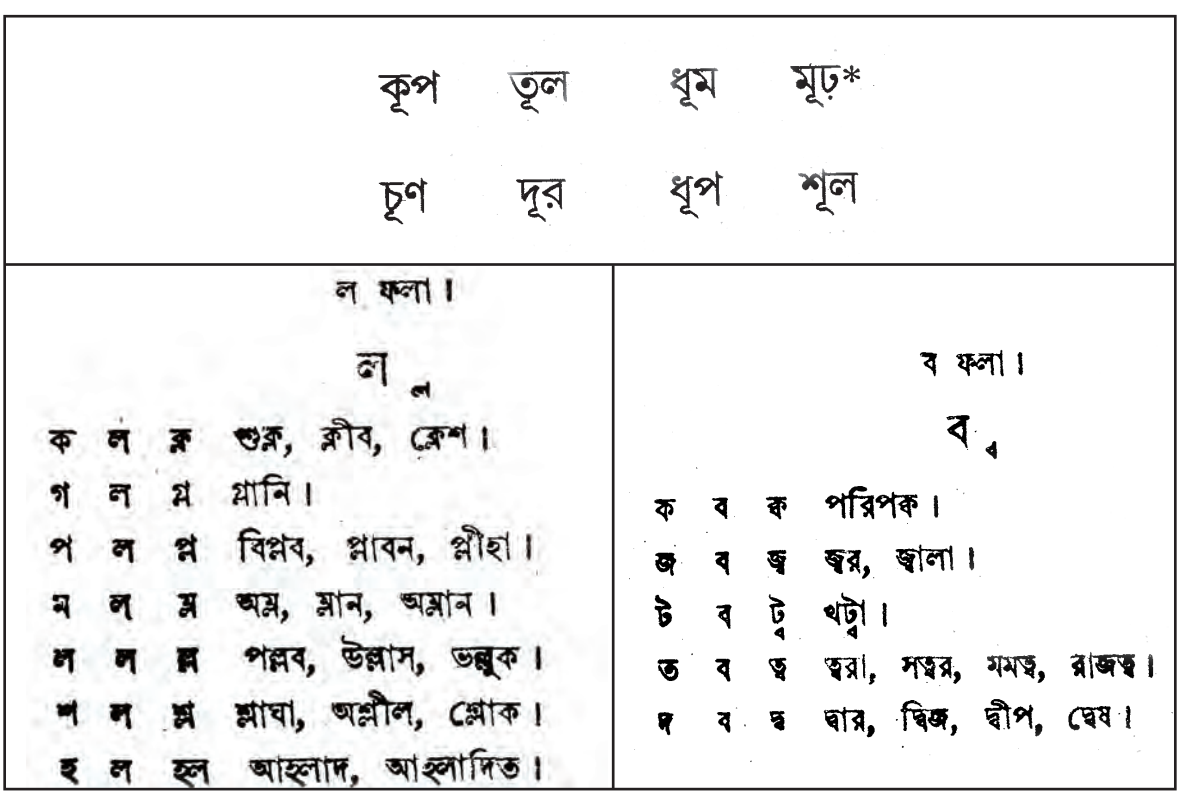

কূপ তূল ধূম মূঢ়*

চূণ দূর ধূপ শূল

ল ফলা।

ল ্ল

ক ল ক্ল শুক্ল, ক্লীব, ক্লেশ।
গ ল গ্ল গ্লানি।
প ল প্ল বিপ্লব, প্লাবন, প্লীহা।
ম ল ম্ল অম্ল, ম্লান, অম্লান।
ল ল ল্ল পল্লব, উল্লাস, ভল্লুক।
শ ল শ্ল শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক।
হ ল হ্ল আহ্লাদ, আহ্লাদিত।

ব ফলা।

ব ্ব

ক ব ক্ব পরিপক্ব।
জ ব জ্ব জ্বর, জ্বালা।
ট ব ট্ব খট্বা।
ত ব ত্ব ত্বরা, সত্বর, মমত্ব, রাজত্ব।
দ ব দ্ব দ্বার, দ্বিজ, দ্বীপ, দ্বেষ।

**(ছ)** লেখা। ছবি। লেখা। শিশুদের মনে লেখার সঙ্গে ছবি দিলে তা যে মনকে আরো বেশি আকৃষ্ট করে এবং শিশুরা জাগতিক বস্তুর সঙ্গে একাত্ম বোধ করে, সেটি ১৫০ বছর আগেই বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। বর্ণের পরিচয়ের সঙ্গে কিছু লেখার পাঠের শেষেও হাওড়ার পোল, বড়লাটের বাড়ি, কাশী, তাজমহল ইত্যাদি ছবি ব্যবহার করেছেন তিনি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য 'সহজ পাঠ'-এ বর্ণ পরিচিতির সঙ্গে ছবির ব্যবহার করেছেন। কিন্তু 'ক' বললেই কুকুর, 'ছ' বললেই ছাগল, 'উ' বললেই উট, 'ও' বললেই ওজন, 'ব' বললেই বাঘ, 'স' বলতেই সিংহ-এর যে ছবি আজ মনে ভেসে ওঠে, সেটা হয়তো ১৫০ বছরের বর্ণপরিচয়ের পৃষ্ঠা থেকেই।

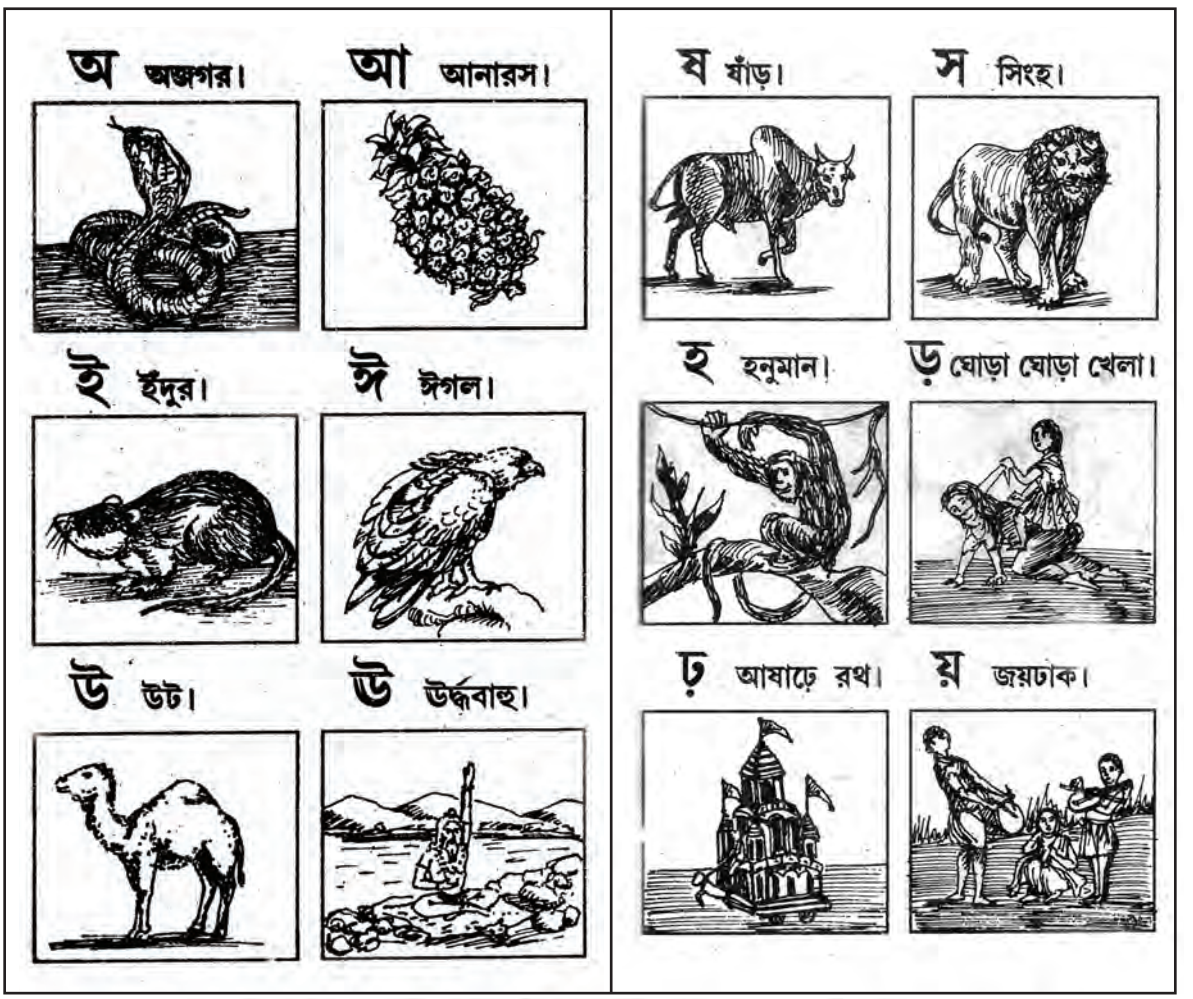

হাওড়ার পোল

## বর্ণপরিচয়-এর জনপ্রিয়তা

একটা বই কতটা জনপ্রিয়, তা বোঝা যায় তার বিক্রির সংখ্যা এবং সংস্করণ দেখে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৯১ অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের প্রয়াণ বর্ষ পর্যন্ত ৩৫ বছরে এই বইয়ের প্রথম ভাগ-এর ১৫২টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়! প্রথম তিন বছরেই ১৮টি সংস্করণ এবং ৮৮ হাজার কপি মুদ্রণ! যে কোনও লেখকের কাছেই আজকের দিণ্ডে এই সংখ্যা পরম লোভনীয় এবং গর্বের বিষয়। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল ৩ হাজার। সেকালের হিসেবে এই সংখ্যাটিও বিপুল। ১৮৬৭ থেকে ১৮৯০, ২৩ বছরে ১২৭টি সংস্করণে এই বই মুদ্রিত হয় প্রায় ৩৩ লক্ষ ৬০ হাজার। বলা যায়, এই সময়ে গড়ে বর্ণপরিচয়, প্রতি বছর ছাপা হয়েছিল ১ লক্ষ ৪০ হাজার কপি। বোঝাই যাচ্ছে, এর সঙ্গে তখন বাংলা শিক্ষাবিস্তারের প্রভাব কতটা বেশি ছিল।

**নানা প্রকাশের নানা মলাটে বর্ণপরিচয়-এর নানা সংস্করণ**

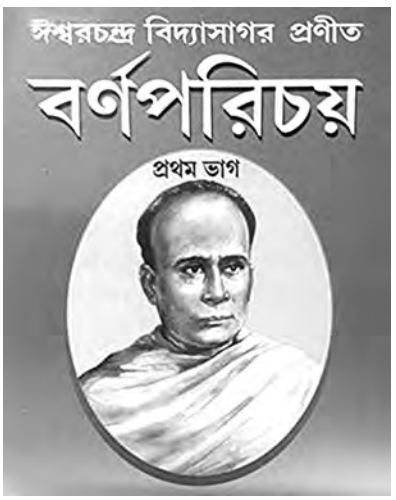

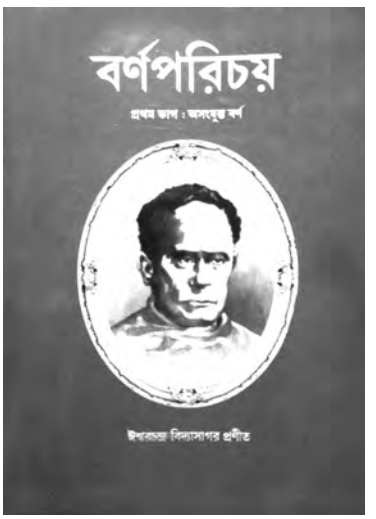

## ‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম ও শেষ সংস্করণে বিস্তর পার্থক্য

‘বর্ণপরিচয়’ প্রথম সংস্করণ এবং শেষ সংস্করণের মধ্যে নাকি অনেকটাই পার্থক্য! অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘বর্ণপরিচয়’ গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৯-২১-এ (প্রকাশক পূর্বা) বিশদভাবে দেখিয়েছেন। বাংলা ভাষার প্রয়োজনে বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায় প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ থেকে প্রথম ভাগের শেষ সংস্করণে কতটা পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করেছেন। ফলে বর্তমানে আমরা হাতে যে বর্ণপরিচয় পাই, সেটি মূল প্রথম সংস্করণ থেকে অনেকটাই পরিবর্তিত।

**১। প্রথম সংস্করণ : স্বরবর্ণ—অ/আ/ই/ঈ/উ/ঊ/ঋ/ঌ/ও/ঔ।**

**২। শেষ সংস্করণ : স্বরবর্ণ—অ>অজগর। আ>আনারস।.....ও>ওল। ঔ>ঔষধ।**

**১। প্রথম সংস্করণ : ব্যঞ্জনবর্ণ—ক/খ/গ/ঘ/**

**২। শেষ সংস্করণ : ব্যঞ্জনবর্ণ—ক>কোকিল। খ>খরগোষ।.....**

**১। প্রথম সংস্করণ : বড় গাছ/ছোট পাতা/লাল ফুল/ভাল জল/সোজা পথ।**

**২। শেষ সংস্করণ : বড় গাছ/ভাল জল/লাল ফুল/ছোট পাতা/.....**

**১। প্রথম সংস্করণ : কথা শুন/হাত ধর/পথ ছাড়/বাড়ী যাও/জল খাও**

**২। শেষ সংস্করণ : পথ ছাড়/জল খাও/হাত ধর/বাড়ী যাও।**

**১। প্রথম সংস্করণ : গিরিশ কাল তুমি পড়িতে আস নাই কেন। শুনিলাম কোন কাজ ছিল না মিছামিছি কামাই করিয়াছ। সারা দিন খেলা করিয়াছ। রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ। বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছুই বলিলাম না। দেখিও আর যেন এমন হয় না।**

**২। শেষ সংস্করণ : গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে আস নাই কেন। শুনিলাম, কোনও কাজ ছিল না, মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সারাদিন খেলা করিয়াছ; রোদে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছ; বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম না। দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয়।**

**১। প্রথম সংস্করণ : গোপাল আপনার ভাই ভগিনীগুলিকে অতিশয় ভালবাসে। কখন তাদের সহিত ঝগড়া করে না ও তাদের গায়ে হাত তোলে না। এ কারণে, তার পিতামাতা তাকে বড় ভালবাসেন।**

**২। শেষ সংস্করণ : গোপাল আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলিকে বড় ভালবাসে। সে কখনও তাদের সহিত ঝগড়া করে না ও তাদের গায়ে হাত তোলে না। এ কারণে, তার পিতামাতা তাকে বড় ভালেবাসেন।**

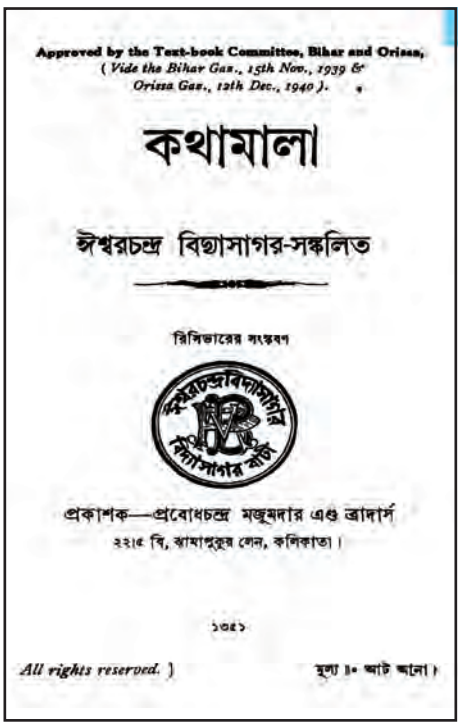
Approved by the Text-book Committee, Bihar and Orissa,
( Vide the Bihar Gaz., 15th Nov., 1939 &
Orissa Gaz., 12th Dec., 1940 ).

কথামালা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-সঙ্কলিত

রিপিভারের সংস্করণ

প্রকাশক—প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স
২২।৫ বি, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৩৫১

All rights reserved. ] মূল্য ।৷০ আট আনা।

বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখতেন, আগামীদিনে সুন্দর বাঙালি শিশু জন্মগ্রহণ করুক যে তাঁর বই পড়েই জীবনের পথচলা শিখবে। বইয়ের ছাপার খরচ কমাতে তাই নিজে তৈরি করেছিলেন নিজস্ব ছাপাখানা—নিজস্ব হরফ, যে হরফে তিনি বর্ণপরিচয় প্রকাশ করার সাহস দেখিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, সংস্কৃতের মতো মধুর কর্কশ বক্র-ললিত ভাষা একজন বাঙালির মনে আগ্রহ জন্মাচ্ছে না। ফলে বহু সংস্কৃত শব্দকে বর্ণপরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদি প্রভৃতি বইয়ে চলিত ভাষার মাঝে ব্যবহার করেছেন। একটি শিশুর যে শুধু পদার্থজ্ঞান থাকলেই হয় না, জীবনযুদ্ধের জন্য কাণ্ডজ্ঞান এবং নীতিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে—তা অস্থিতে মজ্জায় বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। বোধোদয়ের বিষয় তালিকায় তাই স্থান পেয়েছে বিজ্ঞান, ভাষা, কাল, মানবজাতি, মুদ্রা, ধাতু, সমুদ্র, উদ্ভিদ, শিল্প-বাণিজ্য প্রসঙ্গ। ভাষাজ্ঞানের প্রাথমিক স্তর তৈরি হলে একটি শিশু মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে, বুঝেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র।

সবশেষে বলা যায়, একের পর এক শিশুপাঠ্য বই রচনার মধ্য দিয়ে শিশুমনের যে অনন্তকালব্যাপী বিচিত্র ভুবনের দরজায় পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, তা যেন পূর্ণরূপ পেল পরবর্তীকালে রবিকবির সহজপাঠে। বিদ্যাসাগরের রচনায়, বিশেষ করে বর্ণপরিচয়ের দুটি ভাগেই যে ছন্দের সুর শিশুমনে বেঁধে দিতে চেয়েছিলেন, তা যেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের রচনায় হয়ে উঠল মূর্ত। বাংলা গদ্যের যে রাজপথে রবীন্দ্রনাথ তার ছান্দসিক মনের সারথিকে নিয়ে বিশ্বজয়ে বেরিয়েছিলেন, সেই পথে মোরাম পড়েছিল বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সুললিত হাতে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একমাত্র আত্মজীবনীমূলক বই 'জীবনস্মৃতি'-তে যত্ন সহকারে বাড়িতে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ কিনে আনার কথা লিখতেনই না। তাঁর হাতে বর্ণপরিচয় যখন পড়েছিল (১৮৬৪), রবিকবির বয়স ৩ বছর ৪ মাস। ঠাকুরবাড়িতে তখন তিন বালক রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-অগ্রজ ৫ বছরের সোমেন্দ্রনাথ এবং ভাগনে ৪ বছর ১১ মাস বয়সের সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্ণপরিচয় এল ২টি এবং বালক ৩ জন। রবীন্দ্রনাথ বই পেলেন না। ৪ মাস পর ২ আনা দিয়ে আরও দুটি বর্ণপরিচয় এল ঠাকুরবাড়িতে—রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৩ বছর ৮ মাস।

১৮৫৫ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বাঙালির ঘরে প্রথম শিশুপাঠ্য হিসেবে 'বর্ণপরিচয়'-এর 'পুজো' হয়ে চলেছে—চলবেও।

**গল্প : দাঁড়কাক হল ঈগল**

নীতিকথা : সকলকে সব কাজ মানায় না।

**গল্প : প্রত্যুপকার**

নীতিকথা : ইতর প্রাণীরা মানুষের দয়ার কথা ভোলে না। সুযোগ পেলে প্রতিদান দেয়।

# বিদ্যাসাগর রচিত-সম্পাদিত পুস্তকপঞ্জি

১। বসুদেব-চরিত। (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অনুমতি না মেলায় ছাপা যায়নি)।
২। বেতাল পঞ্চবিংশতি। ১৮৪৭ (হিন্দি পুস্তক অনুসারে)।
৩। বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৮৪৮।
৪। জীবন-চরিত, সেপ্টেম্বর ১৮৪৯
৫। বোধোদয়। (শিশুশিক্ষা, ৪র্থ ভাগ)। এপ্রিল ১৮৫১।
৬। সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা। নভেম্বর ১৮৫১।
৭। ঋজুপাঠ, ১ম ভাগ; নভেম্বর ১৮৫১। ২য় ভাগ; মার্চ ১৮৫২। ৩য় ভাগ; ডিসেম্বর ১৮৫২।
৮। সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। ১ মার্চ ১৮৫৩।
৯। ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ; ১৮৫৩। ২য় ভাগ; ১৮৫৩। ৩য় ভাগ; ১৮৫৪। ৪র্থ ভাগ; ১৯৬২।
১০। শকুন্তলা। ডিসেম্বর ১৮৫৪।
১১। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। প্রথম পুস্তক। জানুয়ারি ১৮৫৫।
১২। Marriage of Hindu widow
১৩। বর্ণপরিচয়, ১ম ভাগ; এপ্রিল ১৮৫৫। ২য় ভাগ; জুন ১৮৫৫।
১৪। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব। দ্বিতীয় পুস্তক। অক্টোবর ১৮৫৫।
১৫। কথামালা। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫।
১৬। চরিতাবলী। জুলাই ১৮৫৬।
১৭। পাঠমালা, ১৮৫৯।
১৮। মহাভারত (উপক্রমণিকাভাগ)। জানুয়ারি ১৮৬০।
১৯। সীতার বনবাস। এপ্রিল ১৮৬০।
২০। আখ্যানমঞ্জরী। নভেম্বর ১৮৬৩।
২১। শব্দমঞ্জরী (বাঙ্গলা অভিধান)। ১৮৬৪।
২২। ভ্রান্তিবিলাস। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৯। (শেকস্‌পিয়রের কমেডি অব এররস্‌ অবলম্বনে)।
২৩। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। ১০ আগস্ট, ১৮৭১।
২৪। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার। দ্বিতীয় পুস্তক। ১ এপ্রিল ১৮৭৩।
২৫। নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস। এপ্রিল ১৮৮৮।
২৬। পদ্যসংগ্রহ। প্রথম ভাগ; ১৮৮৮ (২ জুলাই)। দ্বিতীয় ভাগ; ১৮৯০।
২৭। সংস্কৃত রচনা। নভেম্বর ১৮৮৯।
২৮। শ্লোকমঞ্জরী (উদ্ভট শ্লোক-সংগ্রহ)। মে ১৮৯০।
২৯। বিদ্যাসাগরচরিত (স্বরচিত)। সেপ্টেম্বর ১৮৯১।
৩০। ভূগোলখগোলবর্ণনম্‌। এপ্রিল ১৮৯২।

এছাড়া তাঁর সম্পাদিত বাংলা, হিন্দি ও সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা বারোটি। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কে তাঁর পূর্বোক্ত চারখানি (তালিকার ১১, ১৪, ২৩, ২৪ সংখ্যক) বই প্রকাশিত হলে পণ্ডিতমহলের অনেকে তাঁর মতের প্রতিবাদ করেন।

বিদ্যাসাগর ছদ্মনামে পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করেন—

১। অতি অল্প হইল। ৫ মে ১৮৭৩।
২। আবার অতি অল্প হইল। ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।
৩। ব্রজবিলাস। ৩ নভেম্বর ১৮৮৪।
৪। বিধবাবিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা। ১১ নভেম্বর, ১৮৮৪।
৫। রত্নপরীক্ষা। ১৯ অগাস্ট, ১৮৮৬।

এছাড়াও বিদ্যাসাগর বাংলা, সংস্কৃত এবং ইংরাজিতে ১৭টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন।

১। অন্নদামঙ্গল। ১৮৪৭।
২। পদ্যসংগ্রহ। প্রথম ভাগ, জুলাই, ১৮৮৮।
৩। পদ্যসংগ্রহ। দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯০।
৪। বৈতাল পঁচ্চিসি। জানুয়ারি, ১৮৫২।
৫। রঘুবংশম। জুন, ১৮৫৩।
৬। কিরতার্জুনীয়ম। ১৮৫৩।
৭। সর্বদর্শন সংগ্রহ। ১৮৫৮।
৮। শিশুপালবধ। ১৮৫৭।
৯। কুমারসম্ভব। ১৮৬১।
১০। কাদম্বরী। ১৮৬২।
১১। মেঘদূত। ১৮৬৯।
১২। উত্তরচরিতম। ১৮৭০।
১৩। অভিজ্ঞান শকুন্তলম। ১৮৭১।
১৪। হর্ষচরিতম। ১৮৮৩।
১৫। Selections from the writings of Goldsmith.
১৬। Selections from English Literature. ১৮৮২।
১৭। Poetical Selections.

# শব্দসাগর বিদ্যাসাগর

## রাতুল দত্ত

'বিদ্যাসাগরী বাংলা'। এই কথাটা মাঝেমধ্যেই বাংলায় শুনতে পাওয়া যায়। কঠিন শ্লেষোক্তি নাকি খুব বেশি প্রশংসা, অবশ্যই প্রশ্নের দাবি রাখে। কারণ বিদ্যাসাগরকে আমরা চিনি করুণাসাগর হিসেবে। বিদ্যাসাগরকে চিনি রসসাগর হিসেবে। বিদ্যাসাগর ছিলেন নারীশিক্ষা এবং সমাজ চেতনার মূর্ত প্রতীক। বিদ্যাসাগর ছিলেন দয়ার সাগর। কিন্তু গদ্যকার বিদ্যাসাগর এবং শব্দসাগর বিদ্যাসাগরকে বোধহয় আজ ২০০ বছর পরেও নতুন চোখে দেখা প্রয়োজন। মূলত সংস্কৃত ভাষাকে ভিত্তি করে গদ্যের ডালপালা বিস্তার করা এই ভাষাশিল্পী যে নিজস্ব অনুবাদ দক্ষতায় কত নতুন শব্দ বাংলা ভাষাকে উপহার দিয়েছেন—কত তৎসম শব্দকে অর্ধতৎসম বা তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত করেছেন, তার সঠিক সময়োপযোগী মূল্যায়ন প্রয়োজন।

আসলে সংস্কৃত ছিল বিদ্যাসাগরের মুখোশ, একটা আড়ম্বর। আর বাংলাভাষা ছিল তাঁর মুখ। সংস্কৃতের মোড়কে তিনি বাংলা ও বাঙালির রক্তে-অস্থিমজ্জায় নতুন নতুন বাংলা শব্দ মিশিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

নিজে কোনওদিনই সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন না। আবার লেখা পড়লে মনে হয়, কী কঠিন বাংলা! বিদ্যাসাগরের মতোই তাঁর বাংলাও তেমনই অকোমল। কিন্তু এই কঠিন শব্দভাণ্ডারে টইটম্বুর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের 'বর্ণপরিচয়' এবং তাঁর অসমাপ্ত বই 'শব্দ-সংগ্রহ' পড়লেই দেখা যায়, একদিকে এই মনীষীর ছিল অনুবাদ সাহিত্য থেকে নতুন নতুন শব্দ বাংলায় নিয়ে আসার প্রবল ইচ্ছে। অন্যদিকে ছিল খাঁটি বাংলা শব্দের প্রতি টান। শব্দসাগর বিদ্যাসাগর তাই একদিকে বিশিষ্ট অনুবাদকও ছিলেন।

তখনকার দিনে বেশ কিছু নতুন শব্দ বিদ্যাসাগর প্রায়ই ব্যবহার করতেন এবং 'শব্দসংগ্রহ' বইতে তাঁর উল্লেখও রয়েছে। যেমন—

**অ** : অপয়া, অবেলা, অবুজ, অবাক।
**আ** : আওয়াজ, আখড়া, আড়াআড়ি, আক্কেল।
**ই** : ইঁদারা, ইজ্জত।

**বহু দুর্লভ সংস্কৃত শব্দের বাংলায় প্রচলনও তিনি করে গিয়েছিলেন।** যেমন—

১। **বেতাল পঞ্চবিংশতি** : এক রত্ন ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ করি, দ্বিতীয় **দেবসাৎ** করিয়া, তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি। রাজার অন্তঃকরণে নিরতিশয় **নির্বেদ** উপস্থিত হইল

২। **জীবনচরিত** : ডুবলের **টঙ্কবিজ্ঞান** বিদ্যাবিষয়ে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।

৩। **বাঙ্গালার ইতিহাস** : তিনি রাজস্ব বিষয়ে এক উৎকৃষ্ট **পাণ্ডুলেখ্য** প্রস্তুত করেন।
.... **সুরীতি** স্থাপন করিলেন।

৪। **শকুন্তলা** : **নিপানে** অবগাহন করিয়া নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক।
.... শকুন্তলার **প্রয়ণপত্রিকা** করা যাউক।

৫। **শিশুপালবধ** : .... শেষাংশ নিতান্ত **অশক্তিকৃত** হইতেছে দেখিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিতেন না।

৬। **সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব** : শিশুপাল বধ কিরাতার্জ্জুনীয়ের **প্রতিরূপ** স্বরূপ। রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের পর উৎকর্ষ ও **প্রাথম্য** অনুসারে সর্বাগ্রে কিরাতার্জ্জুনীয়ের নির্দেশ দিতে হয়।

এছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বেশকিছু নতুন শব্দ তাঁর বিভিন্ন লেখায় ব্যবহার করেছেন। যেমন—

focal distance কে লিখেছিলেন **অধিশ্রয়ণিক ব্যবধি।**
চুল্লিকে তিনি লিখেছিলেন **অগ্নিস্থান।**
ticket-কে লিখেছিলেন **প্রবেশিকা।**
খিড়কী-কে লিখেছিলেন **খড়ক্কী।**
দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী-কে লিখেছিলেন **পুনর্ভূ।**
মোমবাতিকে লিখেছিলেন **মধুশ্বর্তিকা।**
পাঁচ পা সংক্রান্ত বিষয়কে লিখেছিলেন **পাঞ্চপাদিক।**

শুধু তৎসম শব্দকে বাংলায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন, তা নয়। ক্রিয়াপদ ব্যবহারেও নানা নতুন শব্দ তিনি নিয়ে এসেছিলেন বাংলা ভাষায়। যেমন—সম্বোধিয়া, শুধরিয়া জিজ্ঞাসিল ইত্যাদি।

সংস্কৃত পণ্ডিত ভাষাসাগর বিদ্যাসাগরের শব্দ ব্যবহারের আর একটি নতুন দিক ছিল বিভিন্ন প্রত্যয় এবং বিভক্তি যোগ করে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করা। বিশেষ করে 'ক' প্রত্যয় এবং 'কার' যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং সেজন্য বিদ্যাসাগরের দৌলতে বহু নতুন শব্দ এসেছে বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে। যেমন—**হইবে'ক', যাইবে'ক', আপন'কার'** ইত্যাদি।

তবে শুধুই কী সংস্কৃত শব্দ ধরে ধরে বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন তিনি! কারণ, যাঁর চরিত্র এত কঠিন, যাঁর ভাষা ছিল এত মজবুত, তিনি কীভাবে শুধু সংস্কৃত ভাষাকে অনুকরণ করতে পারেন! তাঁর লেখার মধ্যে অবশ্যই ইংরেজি, পার্শি শব্দ এসে পড়াটাই স্বাভাবিক ঘটনা। আরও বেশি পড়াশোনার জন্য ১৮২৮ সালের হেমন্তের এক পড়ন্ত বেলায় হয়তো বাবার কাঁধে চেপে বা হাত ধরে যে ছেলেটি চলে এসেছিল তখনকার সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতায়; **মাইলস্টোন** দেখে ইংরেজি শিখেছিল, তাঁর লেখায় ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটবেই, আর এটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে সংস্কৃত **কলেজ, ল, মিটিং, কমিটি, প্রিন্সিপাল** ইত্যাদি ইংরেজি শব্দও তাঁর হাত ধরেই ঢুকে পড়েছে বাংলায়।

## বিদ্যাসাগর অনূদিত বেশ কিছু নতুন বাংলা শব্দ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Degree | অক্ষাংশ | Telescope | দূরবীক্ষণ |
| Perverted | অযথাভূত | Optics | দৃষ্টিবিজ্ঞান |
| Discovery | আবিষ্ক্রিয়া | Mineralogy | ধাতুবিজ্ঞান |
| Botany | উদ্ভিদবিদ্যা | Astrology | নক্ষত্রবিদ্যা |
| Coast | উপকূল | Equator | বিষুবরেখা |
| Colonial | ঔপনিবেশিক | Nebulae | নীহারিকা |
| Orbit | কক্ষ | Natural Law | নৈসর্গিক বিধান |
| Monument | কীর্তিস্তম্ভ | Natural Philosophy | পদার্থবিদ্যা |
| Heraldry | কুলাদর্শ | Perspective | পরিপ্রেক্ষিত |
| Prejudice | কুসংস্কার | Observation | পর্যবেক্ষণ |
| Centre | কেন্দ্র | Arithmatic | অঙ্কবিদ্যা/পাটিগণিত |
| Mathematics | গণিত | Inn | পান্থনিবাস |
| Research | গবেষণা | Satellite | পার্শ্বচর/উপগ্রহ |
| Planetary Nebulae | গ্রহ নীহারিকা | Nature | প্রকৃতি |
| Stocking | চরণাবরণ/মোজা | Genius | প্রতিভা |
| Biographer | চরিতাখ্যায়ক | Ticket | প্রবেশিকা |
| Museum | চিত্রশালিকা | Reflecting Telescope | প্রাতিফলিক দূরবীক্ষণ |
| Milky way | ছায়াপথ | Natural History | প্রাকৃত ইতিবৃত্ত |
| Tide | জলোচ্ছ্বাস | Rough | বন্ধুর |
| National Law | জাতীয় বিধান | Metaphysics | মনোবিজ্ঞান |
| Astronomy | জ্যোতির্বিদ্যা | Candle | মোমবাতি |
| Havenly Bodies | জ্যোতিষ্ক | Axis | মেরুদণ্ড· |
| Numismatics | টকবিজ্ঞান | Theatre | রঙ্গভূমি |
| Musician | তূর্যাজীব/ বাদ্য ব্যবসায়ী | Revolution | রাজবিপ্লব |
| Science | বিজ্ঞান | Index | শঙ্কু |
| Report | বিজ্ঞাপনী | Century | শতাব্দী |
| Pure Mathematics | বিশুদ্ধ গণিত | Elasticity | স্থিতিস্থাপক |
| University | বিশ্ববিদ্যালয় | Fencing | স্বাত্মরক্ষা |
| Lawyer | ব্যবহারাজীবী | | |

*[কৃতজ্ঞতা স্বীকার: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সুনন্দ সমাদ্দারের গবেষণাপত্র]*

শিশুসাহিত্য এবং নানা ধরনের মৌলিক রচনার পাশাপাশি বিদ্যাসাগর মন দিয়েছিলেন অনুবাদ সাহিত্যে। মূল সংস্কৃত বই 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' থেকে বিদ্যাসাগর অনুবাদ করেছিলেন 'শকুন্তলা'। হিন্দিতে লেখা বেতাল পঁচ্চিশি থেকে অনুবাদ করলেন 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'। 'ভ্রান্তিবিলাস' লিখলেন শেক্সপিয়ারের Comedy of Errors অনুবাদ করে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ নবেন্দু সেন 'বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপ' নামে একটি রচনায় লিখেছেন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর লেখায় তৎসম শব্দ ব্যবহার করতেন ৫০-৬৪ শতাংশ, তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করতেন ৩৮-৪৮ শতাংশ এবং বাকি বিদেশি শব্দ ২-১৪ অংশ।

অর্থাৎ বিদ্যাসাগরীয় বাংলায় ভাষারীতি এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারে তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁর লক্ষ্য ছিল ত্রিমুখী। (১) তৎসম শব্দের অজস্র প্রাচুর্য এবং তার ব্যবহার (২) দেশি ও খাঁটি বাংলা শব্দের সুন্দর মেলবন্ধন (৩) নতুন নতুন শব্দ তৈরি। আসলে বিদ্যাসাগর এবং দয়ারসাগর পেরিয়ে তিনি যে একজন শব্দসাগরও ছিলেন, সে দিকটা বোধহয় অনেকাংশেই চাপা পড়ে যায়। কেন এই ঘটনা ঘটল? আসলে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র—১৮৬৫ সালে গড় মান্দারণের পথের ধুলো উড়িয়ে যে যুবক সেদিন বাংলা গদ্যের রাজপথে প্রবেশ করেছিল, তার নিশানা দিয়ে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, ১৮৪৭ সালে। [বিদ্যাসাগরের গদ্যরূপ: নবেন্দু সেন, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ]

বাংলায় নতুন শব্দ আনতে গিয়ে আরও দুটি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র। একটি হল—প্রচুর সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার আর দ্বিতীয়টি হল অনুসর্গ-উপসর্গ-প্রত্যয়-বিভক্তি যোগে নতুন শব্দ গঠন। যেমন—

- **প্রভুতা** (কথামালা)। প্রভু থেকে প্রভুত্ব—এই দুটি শব্দ শোনা গেলেও পরবর্তীকালে প্রভুতা শব্দের ব্যবহার আর হয়নি।
- **ভদ্রস্থতা** (কথামালা)। ভদ্র থেকে ভদ্রস্থ—এবং এরপর 'তন্' প্রত্যয় যোগে ভদ্রস্থতা। এটিও বিদ্যাসাগরীয় বাংলার নতুন শব্দ।
- **অতি প্রসঙ্গ**। প্রসঙ্গের সঙ্গে 'অতি' উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ। বাড়াবাড়ি অর্থে বিদ্যাসাগর প্রায়ই এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।
- **অগঙ্গা**। যে দেশে বা যে রাজ্যে গঙ্গা নেই—সেই অর্থে তিনি এই শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।
- **বিচেতন**। বাংলায় 'বি' এই উপস্বর্গটি কখনও বিশিষ্ট বা বিশেষ অর্থে (বিচলিত/বিকশিত ইত্যাদি), কখনও বিপরীত অর্থে (বিকর্ষণ-আকর্ষণ), কখনও বিগত অর্থে (বিগত/বিকল) ব্যবহার করা হয়। সম্ভবত বিদ্যাসাগর বিচেতন শব্দটি চেতনাশূন্য বা চেতনাহীন—এই বোঝাতেই ব্যবহার করেছিলেন এবং এটিও নতুন শব্দ।

শুধু শব্দগুলি শুনলে আজকের দিনে অবশ্যই খটমট লাগতেই পারে। আজকের দিনে এই শব্দগুলির ব্যবহারও প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ৪টি বা ৫টি শব্দকে জুড়ে নতুন তৎসম শব্দ তৈরি করে বাংলায় ব্যবহার করেছিলেন বিদ্যাসাগর। যেমন—**অলৌকিকরূপনিধান, হলাহলহৃদয়, নবমল্লিকাকুসুমকোমলা, সর্বালঙ্কারভূষিতা, শোকভারাক্রান্ত, অন্ধতমসাচ্ছন্ন, বীতশোক, সরসকমলদলশয্যা, নেত্রগোচর** ইত্যাদি।

বিদ্যাসাগরীয় বাংলায় ভাষারীতি এবং বাংলা শব্দভাণ্ডারে তাঁর অবদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাঁর লক্ষ্য ছিল ত্রিমুখী।

আজ থেকে ২০০ বছর আগে বাংলার বুকে জন্মানো এক মনীষী প্রায় ১৫০ বছর আগে ভেবেছিলেন, বাংলার নতুন শব্দভাণ্ডারের কথা। সংযোজন করেছেন বহু নতুন নতুন শব্দ, যার অনেক শব্দই হয়তো আজকাল আর ব্যবহার হয় না বা হলেও তার পরিবর্তন ঘটেছে। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক, তিনি ছিলেন ভাষা সংস্কারক। কিন্তু সচেতন সাহিত্যিক নন। বরং চেয়েছিলেন বাংলা গদ্যসাহিত্যের একটা ভিত তৈরি করে দিয়ে যেতে। যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে একদিকে শিশুসাহিত্য, অপরদিকে অনুবাদ সাহিত্য এবং আর একদিকে নব্য বাংলা সাহিত্য—এই ত্রিধারা বয়ে চলবে আগামী কয়েকশো বছর। শব্দসাগর বিদ্যাসাগর এবং অনুবাদক বিদ্যাসাগর যেন বাংলাভাষা এবং বাংলা ব্যাকরণের এক আর্ষচরিত্র।

# উনিশ শতকে বাঙালির ব্যবসা ও বিদ্যাসাগর

## সর্বাণী আচার্য

দেশের স্বাধীনতা লাভের ঠিক একশো বছর আগের কথা। ১৮৪৭ সাল, ১৬ জুলাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর পদত্যাগ পত্র গৃহীত হল—সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে। কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে সংঘাতের কারণেই এই পদত্যাগ। কারণ, 'এ সংঘাত স্বার্থের সংঘাত নয়, আদর্শের সংঘাত। স্বার্থের সংঘাতের শুরু আছে শেষও আছে। আদর্শের সংঘাতের শুরু আছে, শেষ নেই।'

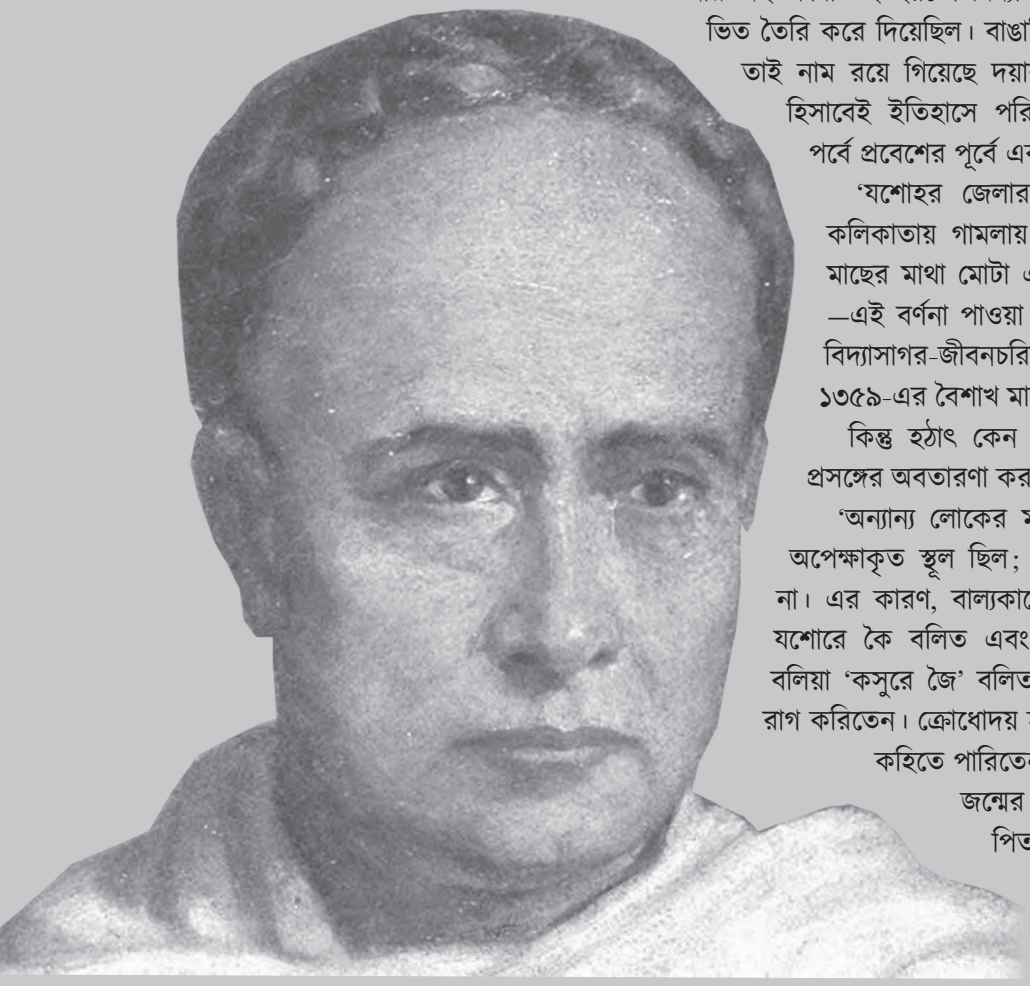

আর এই সংঘাত-ই হয়তো বিদ্যাসাগর-এর ব্যবসায়িক প্রচেষ্টার ভিত তৈরি করে দিয়েছিল। বাঙালির ব্যবসা প্রচেষ্টার ইতিহাসে তাই নাম রয়ে গিয়েছে দয়ার সাগর ও সমাজ সংস্কারক হিসাবেই ইতিহাসে পরিচিত ঈশ্বরচন্দ্রের। তবে এই পর্বে প্রবেশের পূর্বে একটু প্রাক্‌কথন প্রয়োজন।

'যশোহর জেলার কৈ মাছ নৌকায় আসিয়া, কলিকাতায় গামলায় কিছুদিন থাকিত; এজন্য ঐ মাছের মাথা মোটা এবং অপর অংশ সরু হইত।' —এই বর্ণনা পাওয়া যায়, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগর-জীবনচরিত গ্রন্থে, যার প্রথম প্রকাশ ১৩৫৯-এর বৈশাখ মাসে চিরায়ত প্রকাশন থেকে।

কিন্তু হঠাৎ কেন যশোহর জেলার কই মাছের প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন শম্ভুচন্দ্র?

'অন্যান্য লোকের মস্তক অপেক্ষা জ্যেষ্ঠের মস্তক অপেক্ষাকৃত স্থূল ছিল; তদ্রুপ প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। এর কারণ, বাল্যকালে উহাকে কলেজের অনেকে যশোরে কৈ বলিত এবং কেহ কেহ যশোরে কৈ না বলিয়া 'কসুরে জৈ' বলিত। ইহা শুনিয়া অগ্রজ মহাশয় রাগ করিতেন। ক্রোধোদয় হইলে, তখন তিনি সহসা কথা কহিতে পারিতেন না,.....'

জন্মের কিছুক্ষণ পরেই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, 'অদ্য আমাদের একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।

.....এ ছেলে এঁড়ের মতো বড় একগুঁয়ে হইবে, .....ইহার দ্বারা পরে দেশের বিশেষ রূপ উপকার হইবে,.... এ নিজের জিদ বজায় রাখিবে এবং সর্বত্র জয়ী হইবে.....'

পিতামহের বাণী প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। নিজের রাগ ও জেদ অক্ষুণ্ণ রেখেই একের পর এক জনহিতকর কাজে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর বাল্যের এই দুটি ঘটনার খানিকটা সেই কারণেই উল্লেখের প্রয়োজন ছিল।

এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন একাধিক ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৬) এবং বিহারিলাল সরকার (১৮৫৫-১৯২১)-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তবে, সম্ভবত এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন শম্ভুচন্দ্রই। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের তৃতীয় সহোদর এবং তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র। বিভিন্ন কল্যাণকর কাজে তাঁর একনিষ্ঠ অনুগামীও বটে।

নানা রচনাকার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিদ্যাসাগরের চরিত্র চিত্রায়ণ করেছেন। একই ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন ভিন্ন আঙ্গিকে।

কিন্তু সূত্র যাই হোক, প্রাপ্ত তথ্যের তুল্যমূল্য বিচার করেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যই সেদিন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। শুরু করেছিলেন স্বাধীন ব্যবসা।

কিন্তু, ঠিক কী কারণে এই সংঘাত? এই প্রসঙ্গে একটু ফিরে দেখা প্রয়োজন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। একটি প্রশংসাপত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের গুণের বিবরণ দিয়ে মার্শাল লিখেছেন—"On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition and high respectability of character."

১৮৪৬ সালের ৬ এপ্রিল মাসিক ৫০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক পদে কাজ শুরু করেন বিদ্যাসাগর।

কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার বিষয়ে বিশদে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দেন। কলেজের পরিবেশ এবং সার্বিক খোলনলচে আমূল বদলাতে থাকে। শম্ভুচন্দ্রের বিবরণে সজীব হয়ে উঠেছে সেদিনের সংস্কৃত কলেজ—'অনন্তর তিনি ব্যাকরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির অধ্যয়নের নূতন প্রণালী প্রচলিত করিলেন। তদনুসারে অধ্যাপকগণ ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালয়ের কোন কোন শিক্ষক চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতেন; ছাত্রগণের মধ্যে কেহ পাখা লইয়া অধ্যাপককে বাতাস করিত। তিনি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিলেন। সাড়ে দশটার মধ্যেই অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে হইবে, এইরূপ নিয়ম করিয়া দিলেন। অতঃপর সেক্রেটারির বিনা অনুমতিতে কি শিক্ষক, কি ছাত্র কেহই ইচ্ছামতো বিদ্যালয় হইতে বাটী যাইতে পারিবেন না.....'

কলেজে শিক্ষা সংস্কারের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব তৈরি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর সেই সংস্কার পরিকল্পনা জমা দেন আর তার ছ'মাসের মধ্যেই পেশ করেন নিজের পদত্যাগ পত্র। কিন্তু কেন?

নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্যই সেদিন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

> “তৎকালে বাসায় নিরুপায় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় প্রায় কুড়িটি বালককে অন্নবস্ত্র দিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও বাসা হইতে যাইবার কথা একদিনের জন্যও বলেন নাই।”

সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন নথিপত্রের মধ্যে তার বিস্তৃত বিবরণ মিলবে। গবেষক বিনয় ঘোষ-এর কথায়, ‘রসময় দত্তের অসহযোগিতা বিদ্যাসাগরকে বিরক্ত করে তুলেছিল। তাঁর হয়তো আশঙ্কা ছিল যে বিদ্যাসাগর নিজগুণে ক্রমেই কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশি প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা পাবেন।’

পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তাঁর বহু আত্মীয়স্বজন, মতান্তরে স্বয়ং রসময়বাবু আড়ালে বলতে থাকেন, ‘চাকরি যে ছেড়ে দিলে, বিদ্যাসাগর এখন খাবে কি?’

বিদ্যাসাগর এতটুকুও ভীত না হয়ে সেদিন জবাব দিয়েছিলেন, প্রয়োজন হলে আলু-পটল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করবেন তিনি। কিন্তু যে পদে সম্মান বিসর্জন দিতে হয়, সেই পদে তিনি চাকরি করবেন না। অনিশ্চিত জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরচন্দ্র সেদিনও অকুতোভয় ছিলেন।

শম্ভুচন্দ্র লিখছেন, —‘তৎকালে বাসায় নিরুপায় আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয় প্রায় কুড়িটি বালককে অন্নবস্ত্র দিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করাইতেছিলেন। তন্মধ্যে কাহাকেও বাসা হইতে যাইবার কথা একদিনের জন্যও বলেন নাই।..... মধ্যম সহোদর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পদে নিযুক্ত থাকিয়া মাসিক যে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেন, তদ্দ্বারা কলিকাতার বাসাখরচ অতিকষ্টে নির্বাহ হইতে লাগিল। অগ্রজ মহাশয়, দেশস্থ বাটীর মাসিক ব্যয়-নির্বাহের জন্য মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা ঋণ করিয়া প্রেরণ করিতে লাগিলেন।....’

এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও কিন্তু তাঁর বিদ্যাচর্চার কাজ একইভাবে চলতে লাগল। ইংরেজি শিক্ষায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য প্রতিদিন সকালে বউবাজারে পঞ্চাননতলার বাসস্থান থেকে শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যেতেন। সেখানে আগ্রহ সহকারে রাজার দুই জামাই

**সেকালের সংস্কৃত কলেজ**

অমৃতলাল মিত্র ও শ্রীনাথচন্দ্র বসুর কাছে ইংরেজি ভাষার অনুশীলন করতেন।

এই পরিস্থিতিতে অর্থ উপার্জনের যে সম্ভাবনা তাঁর সামনে খোলা ছিল তা ছিল স্বাধীন ব্যবসা-র পথ। কিন্তু মূলধন কোথায়? তাই বিদ্যাকেই তিনি মূলধন করেন। শুরু করেন মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবসা।

বিদ্যাসাগর কিন্তু প্রথম নন। নবযুগের আলোকে আলোকিত বাঙালিদের মধ্যে তখন অনেকেই বাণিজ্যের পথের যাত্রী।

এ বিষয়ে অগ্রগণ্য নাম দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪-১৮৪৭)। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস প্রায় গল্পকথা হয়ে গিয়েছে—ব্যাঙ্কিং, ইনসিওরেন্স, জাহাজ কোম্পানি, রানিগঞ্জের কয়লাখনি ক্রয়—একের পর এক তাঁর দুঃসাহসিক বাণিজ্যিক অভিযান।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ব্যবসায়ী ছিলেন না। ধর্ম সংস্কার ও সমাজ সংস্কার তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হওয়া সত্ত্বেও বেনিয়ানি, মহাজনি ব্যবসা অথবা কোম্পানির কাগজের ব্যবসা—নানা পথেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ।

মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪)-এর নামও এখানে অবশ্যই উঠে আসবে। হাডসন নামে সেকালের এক বিশিষ্ট মদ্য-ব্যবসায়ীকে বোতল ও কর্ক বিক্রি দিয়ে তাঁর ব্যবসা জীবনের শুরু। মুর, হিকি অ্যান্ড কোম্পানি নামে একটি সংস্থার তিনি ছিলেন প্রধান সহযোগী। নীল, রেশম, চাল, চিনি ইত্যাদি নানা সামগ্রীর গুণাগুণ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান ছিল তাঁর। আর এই গুণের জন্যই সেকালে কলকাতার প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি প্রথম সারির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কুড়িটিই তাঁকে 'বেনিয়ান' হিসাবে নিযুক্ত করেছিল। এছাড়া নানা বিদেশি সংস্থার সঙ্গে অংশীদার হয়ে ব্যবসা করেন। করেছিলেন চাল-চিনিসহ নানা দ্রব্য আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাও। 'ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে ইতিহাসে তাঁর নাম রয়ে গিয়েছে। আসাম কোম্পানি লিমিটেড-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এই সংস্থা ভারতে চায়ের ব্যবসা শুরু করেছিল।

ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম সদস্য রামগোপাল ঘোষ সেকালে বাঙালি ব্যবসায়ী হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। পড়াশোনা শেষ করার আগেই উপার্জনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল তাঁকে। ডেভিড হেয়ার-এর সুপারিশে যোসেফ নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে কাজ শুরু করেন। যোসেফ ও কেলসল-এর কোম্পানিতে অংশীদারও হন তিনি। পরে ১৮৪৮ সাল নাগাদ আর জি ঘোষ অ্যান্ড কোম্পানি নামে নিজস্ব ফার্ম খোলেন। প্রভূত সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। রেঙ্গুন-সহ নানা স্থানে তাঁর চালের আড়ত ছিল। এমনকি, ১৮৫০ সালে তিনি বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর সদস্যও নির্বাচিত হন।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী—ইয়ং বেঙ্গল দলের দুই

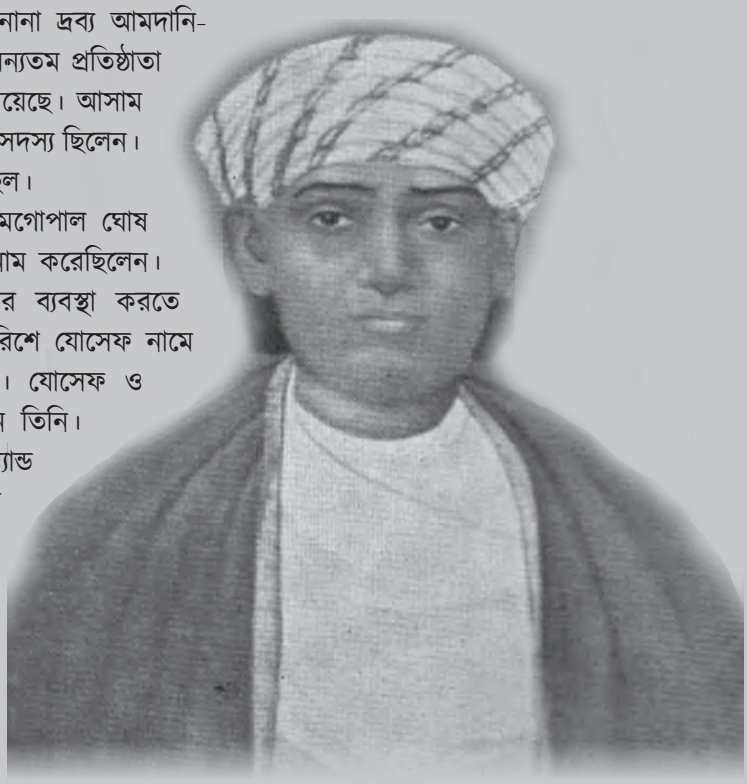

মতিলাল শীল

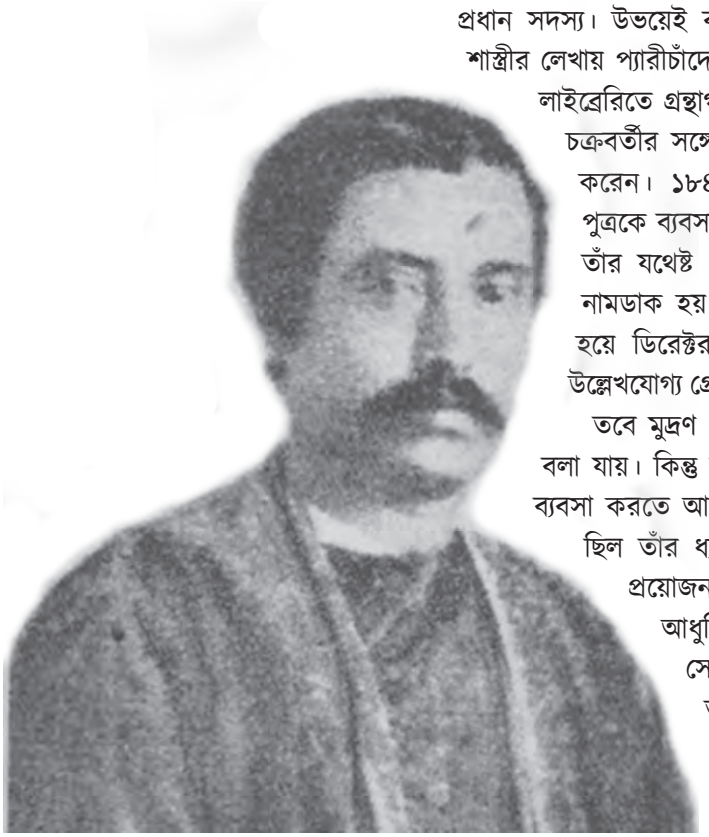

প্রধান সদস্য। উভয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখায় প্যারীচাঁদের কথা বিশদে জানা যায়। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করতেন। আবার তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে নানা জিনিসের আমদানি-রপ্তনীর ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৪৫ সালে তারাচাঁদ মারা গেলে নিজের দুই পুত্রকে ব্যবসার অংশীদার করে নেন প্যারীচাঁদ। এই ব্যবসায় তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়েছিল। সৎ ব্যবসায়ী হিসাবে খুব নামডাক হয় তাঁর। কলকাতার বহু কোম্পানিতে অংশীদার হয়ে ডিরেক্টর পদে আসীন হয়েছিলেন তিনি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল।

তবে মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবসায় বিদ্যাসাগরকেই পথিকৃৎ বলা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নিছক লাভের আশায় তিনি ব্যবসা করতে আসেননি। সমাজ সংস্কার আর শিক্ষার প্রসার-ই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। এর জন্য নিয়মিত অর্থের জোগান প্রয়োজন ছিল। মনের অন্ধকার দূর করে মুক্তমনা আধুনিক মানুষ তৈরির প্রধান হাতিয়ার যে শিক্ষা—সে কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন তিনি। আর তাই প্রয়োজন ছিল মুদ্রিত বইয়ের।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে, মদনমোহন তর্কালঙ্কার তখন ছিলেন সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৪৬ সালে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-এর মৃত্যু হলে মূলত বিদ্যাসাগরের সুপারিশেই মদনমোহনের চাকরি হয়েছিল।



রামগোপাল ঘোষ

এই মদনমোহন ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু। তাঁর সঙ্গেই বিদ্যাসাগর শুরু করেছিলেন ছাপাখানা ও বইয়ের ব্যবসা। শম্ভুচন্দ্র লিখেছেন, '....এই সময়ে অগ্রজ, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া, সংস্কৃত যন্ত্র নাম দিয়া একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ছয়শত টাকায় একটি প্রেস ক্রয় করিতে হইবে; টাকা না থাকাতে তাঁহার পরমবন্ধু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের নিকট ওই টাকা ঋণ করিয়া, তর্কালঙ্কারের হস্তে দিলে, তর্কালঙ্কার প্রেস ক্রয় করেন।....'

ওই অর্থ যত দ্রুত সম্ভব নীলমাধব মুখোপাধ্যায়কে ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। এরপর ঈশ্বরচন্দ্র মার্শাল সাহেবকে তাঁদের ছাপাখানা স্থাপনের কথা জানালে সাহেব বলেন, বিদ্যার্থী সিবিলিয়ানদের যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পড়াতে হয়, তা অত্যন্ত জঘন্য কাগজ এবং অক্ষরে মুদ্রিত। এছাড়া অনেক বর্ণাশুদ্ধি আছে। সাহেবের প্রস্তাবমতো বিদ্যাসাগর কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি থেকে অন্নদামঙ্গল পুস্তক এনে তা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পুঁথি সংগ্রহের জন্য বিদ্যাসাগর নিজেই কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন। সেই শুরু। রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তখন থেকেই। এরপর পূর্ব নির্দেশমতো একশো বই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ছ'শো টাকা পেয়েছিলেন। সেই অর্থে নীলমাধববাবুর ঋণ শোধ হয়। আর অবশিষ্ট বই থেকে কিছু লাভও হয়েছিল। সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্রের যে সমস্ত বই মুদ্রিত ছিল না, সমস্ত গ্রন্থই—একে একে মুদ্রণ করতে লাগলেন

তিনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরির জন্য যে পরিমাণ নূতন বই প্রয়োজন হতে লাগল—সেগুলি ছাপানোর কাজও তাঁর ছাপাখানাতেই হত। ক্রমেই ছাপাখানার কলেবর ও সম্পদ বৃদ্ধি পেতে লাগল। নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও একাধিক শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন বিদ্যাসাগর। বোধোদয়, বর্ণপরিচয়, কথামালা—সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপা হতে থাকে একের পর এক।

প্রসঙ্গত, বিহারিলাল সরকার এখানে লিখেছেন, '....বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উভয়েই এই মুদ্রাযন্ত্রের সমান অংশীদার ছিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তর্কালঙ্কারের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো কারণে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের উপর বিরক্ত হইয়া, তাঁহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হন—শ্যামাচরণ বিশ্বাস ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সালিসি হইয়া গোল মিটাইয়া দেন। প্রেস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পত্তি হয়।'

কিন্তু বই ছাপলেও তার বিক্রয়ের ব্যবস্থা কী হবে? কারণ, বইয়ের দোকানের প্রচলন তখনও সেভাবে হয়নি কলকাতা শহরে। অবাক হতে হয়, বিদ্যাসাগর বই বিক্রির জন্য দোকানও প্রতিষ্ঠা করলেন—হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ চত্বর থেকে কিছুটা দূরত্বে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই প্রসঙ্গে একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। '...বিদ্যাসাগর মহাশয় খুব পরিশ্রম করিতে পারিতেন, তাঁহার অনেকগুলি বই ছিল। তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পরিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে। তিনি প্রেসের কাজ বেশ জানিতেন—বুঝিতেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি সংস্কৃত প্রেসের মালিক ছিলেন। তখন সংস্কৃত প্রেসই বাংলার ভাল প্রেস ছিল। তিনি সংসারের কাজ খুব বুঝিতেন; প্রেস হইল, বই ছাপা হইল, বিক্রয় করিবে কে? তাহার জন্য সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারি (১৮৪৭) নাম দিয়া এক বইয়ের দোকান খুলিলেন। উহা একরকম বইয়ের আড়ত। বই লিখিয়া ছাপাইয়া লোকে ওখানে রাখিয়া দিবে। বিক্রয় হইলে কিছু আড়তদারী বা কমিশন লইয়া গ্রন্থকারকে সমস্ত টাকা দিয়া দিবেন।....'

অর্থাৎ, শুধু নিজের প্রকাশিত বই নয়—অন্যের প্রকাশিত বই-ও এজেন্সি গ্রহণ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতেন বিদ্যাসাগর।

পুস্তক রচনার কাজও চলছিল সমানতালে। সেকালে ভালো বাংলা বই ছিল না। সিবিলিয়ানদের পড়াশোনায় বিশেষ সমস্যা হত। ১৮৪৭ সালেই মার্শাল সাহেবের অনুরোধে হিন্দি ''বৈতাল পঁচ্চিসী'' নামক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন তিনি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লাইব্রেরিতে ওই গ্রন্থের একশোটি সংখ্যা রাখা হয়। এর মূল্যস্বরূপ তিনশো টাকা পেয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। এতে ছাপানোর ব্যয় নির্বাহ হয়েছিল। অবশিষ্ট চারশো পুস্তকের মধ্যে প্রায় দুশোটি আত্মীয় ও বন্ধুদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

মার্শম্যান রচিত 'হিস্টরি অব বেঙ্গল'-এর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। বিহারিলাল সরকার বলেছেন, 'সর্বত্র ইহার আদর হইয়াছিল। ভাষা মনোহর, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।' অল্পদিনের মধ্যেই সমস্ত বই নিঃশেষ হয়ে যায়।

"তিনি সব বইয়ের প্রুফ নিজে দেখিতেন এবং সর্ব্বদাই উহার বাংলা পরিবর্ত্তন করিতেন। দেখিতাম প্রত্যেক পরিবর্ত্তনেই মানে খুলিয়াছে।"

> “কোথায় কোন অক্ষরটি থাকিলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া তাহা নির্ধারিত করেন। ইহার পূর্বে অক্ষর-যোজনার এমন সুবিধা ছিল না।”

এর কয়েকদিন পর বিদ্যাসাগর ‘জীবনচরিত’ নামক বই-এর মুদ্রণ করেছিলেন। রবার্ট উইলিয়ম চেম্বার্স প্রসিদ্ধ মনীষীদের জীবনবৃত্তান্তের যে সংকলন তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখের জীবনীর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। এই বিষয়েও বিদ্যাসাগরকে পথিকৃত বলা চলে। কারণ, জীবনচরিত সংকলনের কাজ তখনও পর্যন্ত এদেশে কেউ শুরু করেননি। বাংলার ছাত্রদের সুবিধার্থে বিদ্যাসাগরই এ কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলা চলে। প্রকাশিত হওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত সংখ্যা নিঃশেষিত হয়ে যায়।

বিদ্যাসাগর প্রকাশনা ব্যবসা কেবল শখের বশে করেননি। তাই গ্রন্থ মুদ্রণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই তিনি দক্ষতা অর্জন করেন রীতিমতো পরিশ্রম করে। বিহারিলাল সরকার-এর লেখায় এর কিঞ্চিত আভাস মেলে—“ছাপাখানায় ইংরেজী বর্ণাক্ষরে ৭০।৭২টি ঘর, বাঙ্গালায় ৫০০ ঘর। ‘র’ ফলা, ‘ঋ’ ফলা, ‘য’ ফলা এমন কত আছে। এই সব অক্ষর-যোজনা সামান্য কষ্টকর নহে। কোথায় কোন অক্ষরটি থাকিলে অক্ষর-যোজকের যোজনাপক্ষে সুবিধা হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বহু পরিশ্রম করিয়া তাহা নির্ধারিত করেন। ইহার পূর্বে অক্ষর-যোজনার এমন সুবিধা ছিল না। তিনি অক্ষরসংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অনেক স্থলেই তাহা অনুকূল হইয়া থাকে। তাহার নাম ‘বিদ্যাসাগর সার্ট’।”

বছর দুয়েকের মধ্যে ব্যবসায় বেশ উন্নতি করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কোষাধ্যক্ষের চাকরি লাভ করেন। এরপর ১৮৫০ সালের শেষদিকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে চলে যান। ময়েট সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তখন সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করতে হয়। এর অল্পদিন পরে সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে কলেজের অধ্যক্ষপদ সৃষ্টি করা হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেই পদে নিযুক্ত হন।

বিদ্যাসাগর একাধারে ছিলেন লেখক, আবার সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারির মালিক। ফলে নিজের সম্মান বিসর্জন দিয়ে কোনওদিনই কোনও পদ আঁকড়ে পড়ে থাকেননি তিনি। যে কোনও শিক্ষায়তনে নিজের শর্তে চাকরি করেছেন।

পরিশেষে, সমসাময়িক আরও একজন বাঙালির কথা না বললেই নয়। তিনি অম্বিকা কালনার পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮১২-১৮৮৫)। ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শ্রেণির অধ্যাপক পদে যোগদানে রাজি করাতে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে কালনা গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। ১৮৪৪ সালে পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যুতে ওই পদটি খালি হয়। এরপর বিদ্যাসাগরের নাম ওই পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেন, তারানাথ তাঁর থেকে অনেক বড়ো পণ্ডিত। ফলে নিয়োগপত্র পাওয়ার অধিকার কেবল তাঁরই আছে। এই তারানাথ সংস্কৃত কলেজ ও কাশীর পণ্ডিতদের কাছে সর্বশাস্ত্র পাঠ শেষ করে কালনায় একটি টোলের পত্তন করেন। আবার একই সঙ্গে তিনি শুরু করেন স্বাধীন ব্যবসা।

তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। তিনি মনে করতেন, ছাত্রদের ভরণপোষণের দায়িত্ব একান্তভাবেই তাঁর একার। কাপড়, কাঠ এবং ঘি-এর ব্যবসা করে বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিহারিলাল সরকার তাঁর এই ব্যবসায়ী জীবন নিয়ে বহু কথা লিখেছেন।

তর্কবাচস্পতি প্রথমে একটি কাপড়ের দোকান খোলেন। ওই সময় বিলাতি কাপড়ের আমদানি ছিল না। তাই বিলেতের সুতো এনে অম্বিকা কালনায় প্রায় বারোশো তন্তুবায়কে দিয়ে তিনি বস্ত্র প্রস্তুত করাতে লাগলেন। পরে রাধানগর গ্রামেও বস্ত্র প্রস্তুতের কুঠি তৈরি করেন। কাশী, মির্জাপুর, কানপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র-সহ নানা দূর দেশে সেই কাপড় যেত।

কাঠের ব্যবসায় নেমে প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হন। কালনায় তৈরি করেন প্রকাণ্ড এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। নেপাল থেকে শাল কাঠ আনিয়ে বিক্রি করতেন তর্কবাচস্পতি। এর দোকান করেছিলেন কলকাতার বড়বাজারে।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

সেই সময়েই অসংখ্য ঢেঁকি বসিয়ে চাল ছেঁটে তা বিক্রির ব্যবসাও করেছিলেন তারানাথ। ঢেঁকির শব্দে গ্রামের লোকের ঘুম ভেঙে যায়। তখন গ্রামের দক্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে ওই ঢেঁকি স্থাপন করে নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে লাগলেন। বীরভূমের সিউড়িতে গয়নার দোকান তৈরি, ওই জেলাতেই চাষের জন্য পাঁচশো গরু কিনে দুগ্ধজাত দ্রব্য বিক্রি, প্রতি বছর কাশ্মীরী শালের বিপণন সমস্তই করেছেন তারানাথ।

এই তারানাথের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্রাবস্থা থেকেই। হয়তো কোনওভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে, তারানাথের মতো ব্যবসার সর্বক্ষেত্রে বিচরণ করেননি বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর তাঁর বণিকসত্তা শুধুমাত্র বই রচনা, প্রকাশনা ও মুদ্রণের কাজেই ব্যবহার করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক বহুমুখী চরিত্র। বিবিধ তাঁর কার্যপন্থা। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঘিরে নানা গল্পকথাও তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। চরিত্র রচনাকারদের পক্ষে সেই সমস্ত অতিরঞ্জন বর্জন করা সবসময় সম্ভব হয় না।

এক বিশিষ্ট চরিত্র রচনাকার Ernest Renan এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

'.....Two accounts of the same event given by different

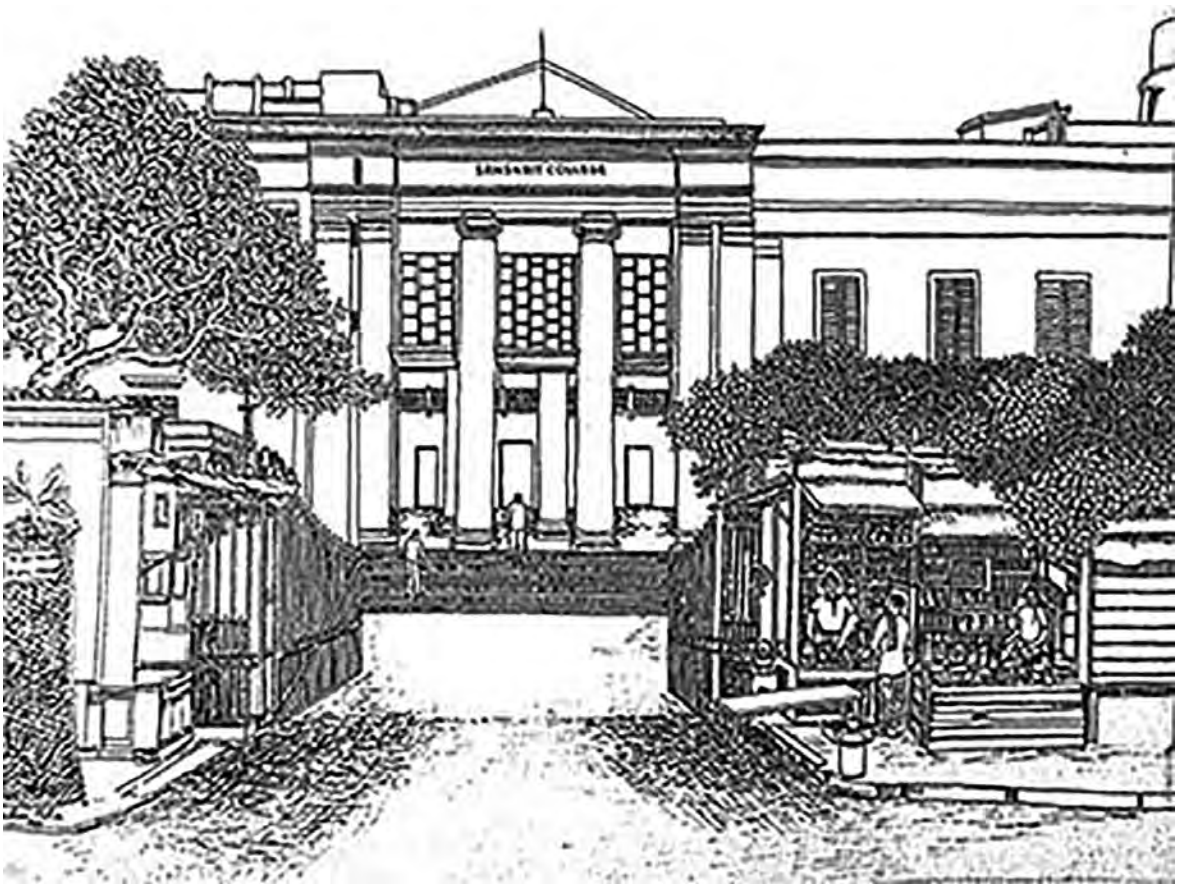

eye-witness differ essentially. Must we, therefore, reject all the coloring of the narratives, and limit ourselves to the bare facts only? That would be to suppress history.....'

—সেই আলোকেই বিদ্যাসাগর-এর চরিত্র বিশ্লেষণ করা ভালো। তবে, সত্য-অতিরঞ্জন মিলিয়েও বিদ্যাসাগর যে যুগপুরুষ ছিলেন সেকথা অনস্বীকার্য।

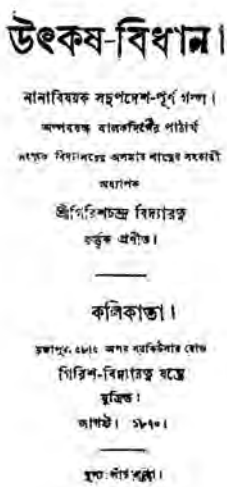



উৎকষ-বিধান।

নানাবিষয়ক সদুপদেশ-পূর্ণ গল্প।

অল্পবয়স্ক বালকদিগের পাঠার্থ

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অলঙ্কার শাস্ত্রের সহকারী

অধ্যাপক

শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন

কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা।

মির্জাপুর, ৫৮।৫ অপর সরকিউলার রোড

গিরিশ-বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

মুদ্রিত।

আগষ্ট। ১৮৭০।

মূল্য [illegible]।

মুদ্রণ থেকে প্রকাশনা এবং গ্রন্থবিক্রয় পর্যন্ত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ নিজেই পরিচালনা করতেন বিদ্যাসাগর। এবং এই বিপুল কর্মযজ্ঞ অনুপ্রাণিত করেছিল তাঁর সহযোগী এবং সমসাময়িক অনেককেই। এঁদের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-এর নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নও প্রাথমিকভাবে তাঁর প্রেসেই মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। পরে তিনি নিজে স্বাধীনভাবে প্রেস প্রতিষ্ঠা করে ব্যবসা করেছিলেন।

বলাই বাহুল্য বিদ্যাসাগর-এর প্রেস ও ডিপোজিটরিতে বহু লোক প্রতিপালিত হত। কিন্তু ক্রমে তিনি তাদের কারও কারও প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। কাজে বিস্তর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। হিসাবপত্রেও গড়মিল ধরা পড়ে যথেষ্ট। এই সময় রাজকৃষ্ণবাবুকে ডিপোজিটরির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন বিদ্যাসাগর। রাজকৃষ্ণ ছিলেন তাঁর আজীবন সুহৃদ। কিন্তু তখন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ৮০ টাকার বেতনে হেড

অ্যাসিস্ট্যান্ট। বন্ধুর অনুরোধে ১৮৫৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর কলেজ থেকে ছ-মাসের জন্য অবসর নেন। তাঁর অধ্যবসায় ও কর্মগুণে এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ডিপোজিটরিতে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। হিসাবপত্র এত নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছিল যে, যে কোনও প্রয়োজনে আয়-ব্যয়ের অবস্থা জানতে—এতটুকু সমস্যা হত না।

বিদ্যাসাগর ও তাঁর বাবা দুজনেই এরপর রাজকৃষ্ণকে স্থায়ীভাবে ডিপোজিটরির দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। সেখানে তাঁর বেতন হয়েছিল মাসে দেড়শো টাকা।

রাজকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগরের মিলিত যত্ন ও পরিশ্রমে প্রেস ও ডিপোজিটরি একটি লাভজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল সেদিন। কিন্তু শুধুমাত্র পরোপকার করতে গিয়ে একদিন এই প্রেসও বিক্রি করে দিতে হয় বিদ্যাসাগরকে।

১৮৭৯ সালের ৯ আগস্ট রাজকৃষ্ণকে সংস্কৃত প্রেসের এক তৃতীয়াংশ চার হাজার টাকার বিনিময়ে এবং কালীচরণ ঘোষকে একই মূল্যে আরও এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করেন।

বিহারিলাল লিখেছেন, 'রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই শুনিয়াছি শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছাপাখানার অংশ বিক্রয় করিয়া তাঁহার দেনা পরিশোধ করেন। দেনার দায়ে বিদ্যাসাগরের সাধের ছাপাখানা বিক্রীত হইল।'

পরে কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডিপোজিটরি প্রদান করেন। এরপর দু-একজন ব্যক্তি ৫-৬ হাজার টাকা দিয়ে ডিপোজিটরির স্বত্ব কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হননি। তিনি বলেন, একবার যা দিয়েছি, কোটি টাকা পেলেও তা আর ফিরিয়ে নেব না।

একটা অধ্যায় এভাবেই শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আপামর বাঙালি জাতিকে যে দিশা তিনি দেখিয়েছিলেন তা আজ দুশো বছর পরেও একইভাবে প্রাসঙ্গিক।

NITIBODHA
OR
MORAL CLASS-BOOK
BY
RAJKRISHNA BANERJEA.
TWENTY-FOURTH EDITION.
নীতিবোধ।
শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় [redacted]।
চতুর্বিংশ সংস্করণ
CALCUTTA:
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
[redacted]
1882.


গ্রন্থ ঋণ

১। বিদ্যাসাগর জীবনচরিত: শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

২। বিদ্যাসাগর: বিহারিলাল সরকার

৩। বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ: বিনয় ঘোষ

৪। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ: শিবনাথ শাস্ত্রী

# নূতন ভুবন, নূতন আলোক

## সাহানা নাগচৌধুরী

টুনটুনির কথাটা মনে আছে তো কী বলেছিল? বলেছিল 'রাজার ঘরে যে ধন আছে, টুনির ঘরেও সে ধন আছে'। কোন সাগরছেঁচা মণি মাণিক্যর কথা সে বলেছিল, এত জোরের সঙ্গে? রাজা মশায়ের সেই বিশাল সাম্রাজ্যের পরিমাপ টুনি কিভাবে আন্দাজ করেছিল এটাও বিস্ময়কর। তবে টুনটুনির এই কথাটি এতটাই গভীর তাৎপর্যময় যে তার গূঢ়ার্থ খুঁজতে চেষ্টা চালালে দেখা যাবে এক অন্য অর্থ যেন এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে এই ধন কী? আমরা বলতেই পারি এই ধন এমন যা অপরিমেয়। এর পরিমাপ করার জন্য আকাশের তারা গুনলেও শেষ হয় না। এর গভীরতা মাপার জন্য সাগরের ঢেউও শেষ কথা নয়। প্রাচীন যুগের দার্শনিক মৈত্রেয়ী কি এই ধনের খোঁজ করতে গিয়েই বলেছিলেন 'যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম' যা নেই অমৃতে তা নেই অমৃতে? এই বিস্ময়কর ধনটির নামই কি 'জ্ঞান'? প্রাজ্ঞতা? টুনটুনি রাজার ঘরের জ্ঞানের সম্পদ দেখেই কি এই মন্তব্যটি করেছিল? রাজার ঘরে যে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত হয়, তা কি সত্যিই টুনটুনির ঘরেও জ্বলে ওঠে? এই প্রতিবেদনটি লিখতে শুরু করার সময় এই কথাগুলি মনে এল।

প্রতিবেদনটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল বাংলার মেয়েদের জীবনে শিক্ষার আলোকরেখা কিভাবে ছুঁয়ে গেল। টুনটুনির কথার সূত্র ধরে বলা যায় ওই মণি মাণিক্যর হদিশ কিভাবে পেল এরা। কারা? আজ থেকে বহু বহু আগের দিনের বাংলার মেয়েরা, যাঁরা তখন সমাজে মানুষ হিসাবে স্বীকৃত হননি। এ কাহিনির শুরু সেই সময় যখন ভারতবর্ষের

**বেথুন স্কুল**

রাজদণ্ড ধীরে ধীরে চলে গেল বহুদূরে থাকা ইংল্যান্ডেশ্বরীর হাতে। যখন ইউরোপিয়ানরা সুদূর সাগর পেরিয়ে এই ভূখণ্ডে এসেছিলেন সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে। তাঁরা ভারতবর্ষের প্রচুর ধন-সম্পত্তির সন্ধানে এসেছিলেন। মুসলিম শাসনের শেষ ধাপে ইউরোপের থেকে ডাচ, পর্তুগিজরা প্রথমে পর্যটক হিসাবে, পরে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে এদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। সুলতান আমলের শেষ পর্বে যখন বাংলার সাধারণ জনগণ মুসলিম শাসকদের অত্যাচারে জর্জরিত, তখন এদেশে বিদেশে থেকে আসেন এইসব ধনী ব্যবসায়ী। সঙ্গে আনেন বেশ কিছু ধর্মযাজককে। ভারতবর্ষ বিশেষত বাংলা সমাজে ভয়ানক তখন মাৎস্যনায় চলছিল। এক তীব্র অস্থিরতা, তার উপর সঙ্গে ছিল অশিক্ষার প্রভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক সমাজ। এই অশিক্ষাক্রান্ত দেশে তাঁরা প্রথমে ধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করেন। তাঁরা মূলত খ্রিস্টধর্মের প্রচারের উপরই জোর দিতেন। তখন সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান ছিল নীচে, এমন এক সামাজিক অবস্থায় তাঁদের রাখা হত যে শিক্ষা তো দূরস্থান, তাঁদের মানুষ বলেই ধরা হত না। বাঙালি পুরুষরা তখন বিদ্যালয়ের থেকেও সংস্কৃত টোলগুলিতে বেশি যেতেন। হিন্দু পণ্ডিতরা এই সব টোলে আর যাই শিক্ষা দিন না কেন, তাতে কোনো ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্বদরবারে যে আধুনিক শিক্ষা দিনের আলোর মতো মুখ দেখাতে শুরু করেছিল, ভারতবর্ষ তার থেকে দূরেই ছিল। পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণের মতো ধর্মগ্রন্থ এইসব পণ্ডিত তখন শিক্ষা দিতেন। ফলে কোনো ব্যক্তিকে সর্বাঙ্গীণরূপে গড়ে তোলার ব্যাপারে এক কূপমণ্ডূকতা তৈরি করেছিল। মুসলিম সমাজের অবস্থাও ছিল অনুরূপ। সাধারণ মুসলমানরা কোনো মৌলবির কাছে মসজিদ বা মাজারে কোরান, হাদিস ইত্যাদি পাঠ করতেন।

এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন শিক্ষা দেশবাসীকে কোনোভাবেই যথার্থ রূপ দেয়নি। ফলে তৈরি হয়েছিল এক প্রাচীন সমাজ আর সেই সুযোগ নিয়েই বিদেশি শক্তি জাঁকিয়ে বসল দেশে। সিপাহি বিদ্রোহের পরে যখন পুরোপুরি এই দেশের শাসন ব্রিটিশদের হাতে চলে গেল বলা যায়, সেই সময় থেকেই শুরু হল ইংরেজি শিক্ষা। এই ইংরেজি শিক্ষা এই দেশেও পড়ানো শুরু হল। অবিভক্ত বাংলা ছিল ইউরোপিয় শাসনের মূল কেন্দ্র। অতএব পুরো বাংলাতেই ইংরেজি শিক্ষার সুফল দ্রুত পাওয়া যেতে লাগল। মনে রাখতে হবে, যখন ইংরেজি শিক্ষা ইংরেজরা ভারতবাসীকে শেখাচ্ছেন, তার পিছনে ব্রিটিশদের এক উদ্দেশ্য ছিল, তাঁদের শাসনকে সুষ্ঠুভাবে চালনা করার জন্য প্রথমেই কিছু দেশের কর্মচারী তৈরি করার প্রয়োজন ছিল। তাই রাজকর্মচারী হিসাবে তাদের শিক্ষা দেওয়া হত। বাংলার নারীদের মধ্যেও যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে এই বোধ কোনোভাবেই মাতব্বররা মনে করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই মেয়েদের কিরকম অবস্থা ছিল, তা বোঝা যায় সেই সময়ের প্রচুর সাহিত্য বা দলিল পড়ে। অত্যন্ত শিশু বয়সেই পরিবারের কন্যাদের বিবাহ হয়ে যেত। শুধু তাই-ই নয়, হিন্দু শাস্ত্রের অতি বর্বর কৌলীন্য প্রথার সুবাদে অসমবয়সী পুরুষের সঙ্গে যে শিশুকন্যার বিবাহ ঘটত, তার পরিণতি ছিল মারাত্মক। স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে সহমরণে যেতে হত 'সতী' হবার জন্য। যে সমাজে হাজার হাজার শিশুকন্যা থেকে নারীকে মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিজেকে উৎসর্গ করতে হত, সেই সমাজে নারীদের বিদ্যার্চনার জন্য আদৌ কোনো ব্যক্তি ভাবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে বলতে

**বিশ্বদরবারে যে আধুনিক শিক্ষা দিনের আলোর মতো মুখ দেখাতে শুরু করেছিল, ভারতবর্ষ তার থেকে দূরেই ছিল।**

নারীজাতির এই দুঃসময়ে তখন আমাদের দেশের কতিপয় বিদ্বজ্জন তাঁদের শিক্ষিত করার কথা ভাবেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার অন্যতম মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। তিনি যে তাঁর সময়ের এক যুগোত্তীর্ণ পুরুষ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার মেয়েরা যাতে কোনোভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন, তার জন্য হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণেরা হিন্দু শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে 'সতী' নামক যে বর্বর প্রথার জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন।

দ্বিধা নেই এই তৎকালীন বাংলায় মেয়েদের শিক্ষিত করার চিন্তা প্রথমে আসে এই বিদেশি শাসকদের মাথাতেই। বাংলার মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার উদ্যোগ নেন। তাঁরা বুঝেছিলেন সমাজের এক পক্ষের উত্থানে সমাজ কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না।

নারীজাতির এই দুঃসময়ে তখন আমাদের দেশের কতিপয় বিদ্বজ্জন তাঁদের শিক্ষিত করার কথা ভাবেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলার অন্যতম মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়। তিনি যে তাঁর সময়ের এক যুগোত্তীর্ণ পুরুষ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার মেয়েরা যাতে কোনোভাবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন, তার জন্য হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণীয় ব্রাহ্মণেরা হিন্দু শাস্ত্রের বিধান দেখিয়ে 'সতী' নামক যে বর্বর প্রথার জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠেন। আর তাঁর এই অসীম সাহস তিনি অর্জন করেন, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান থেকেই। রামমোহন যেন সে যুগের এক 'ত্রিকালদর্শী প্রাজ্ঞ ব্যক্তি' ছিলেন। তিনি একই সঙ্গে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ও ইংরেজি ভাষা জানতেন। এই তিন ভাষাতেই স্বচ্ছন্দে বলতে ও লিখতে পারতেন তিনি। হিন্দু-শাস্ত্র ঘেঁটে তিনি দেখান, প্রাচীনকালে নারীদের স্থান কতখানি উঁচুতে ছিল। তিনি 'নারীর অধিকার' নামক এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রচনায় লেখেন, *"বলা হচ্ছে যে বোধশক্তিতে নারী নিকৃষ্ট, কিন্তু কবে তাকে তার বোধশক্তির পরিচয় দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো? শিক্ষা ও জ্ঞানদানের পরে যদি দেখা যায় যে তা গ্রহণ করতে অক্ষম তখন তাকে মূর্খ বলা যেতে পারে। কিন্তু নারীকে বিদ্যার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে তাকে নিকৃষ্ট আখ্যা দেওয়ার কোনও যুক্তি আছে কি?"* রামমোহন বুঝেছিলেন নারীদের শিক্ষা দেওয়ার আগে দরকার 'সচেতন-চর্চ্চিত' আধুনিকতা। আর এই আধুনিকতা স্থাপন করবার জন্য প্রয়োজন সেই সময়ের সরকারের

**সতীদাহ প্রথার এক দৃশ্যের স্কেচ**

পূর্ণ সমর্থন। ইউরোপিয় মিশনারিরা যে ধর্মশিক্ষা তখন বাংলায় শুরু করেছিলেন, তা দেওয়া যাবে না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় শিক্ষা কোনও জ্ঞানের আলো স্ফুরিত করে না, তাই ব্রিটিশ শাসকের শিক্ষার প্রতি রামমোহনের অসীম আগ্রহ ছিল। কারণ সেই শিক্ষা ছিল জ্ঞানের আলোতে মোড়া এক আধুনিক বিশ্বের শিক্ষা। রামমোহন সেই শিক্ষার প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। তাই ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অতি প্রগাঢ়। অসীম জ্ঞানের অধিকারী রামমোহন বুঝেছিলেন 'সতী' প্রথা অবিলম্বে বন্ধ না হলে সমাজের বিপুল ক্ষতি আর তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারও চাইছিলেন ওই প্রথা নিবারণ করার। কারণ এই প্রথা বন্ধ হচ্ছে না কেন এই নিয়ে বহু সমালোচনার মুখে তাদের পড়তে হচ্ছিল ফলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রামমোহন রায় বুঝেছিলেন এই কাজটিকে যদি আইনের মারফত বন্ধ না করা যায়, তাহলে মেয়েদের সমাজ পশুর সমাজে পরিণত হতে বিলম্ব ঘটবে না। দূরদর্শী এই ব্যক্তি সমাজকে অন্য চোখে দেখতেন। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে অগাধ বিবরণে তিনি জানতেন সমাজটার কি অবস্থা। তাই এই ব্যক্তি বারবার বলেছিলেন, সমাজে বিধবা হিন্দু নারীদের সতী হওয়ার কোনও ব্যাখ্যা হিন্দুশাস্ত্রে নেই। তাই সমাজের পণ্ডিতরা যা বিধান দিচ্ছেন তা সর্বাংশে ভ্রান্ত ও মিথ্যায় ভরা।

রামমোহন বারবার হিন্দুশাস্ত্রকে উল্লেখ করে দেখিয়েছিলেন 'সতী' হওয়ার কোনও নিদর্শনই হিন্দুশাস্ত্রে নেই। অতএব সমাজের পণ্ডিতরা যা বিধান দিচ্ছেন তা ভ্রান্ত ও অপরাধ। রামমোহনের সুচিন্তিত প্রবন্ধ বা কাজ যে সময়ের, সেই সময় বদ্ধ জলাশয়সম সমাজ ছিল লিঙ্গবৈষম্যের এক প্রাচীন ধাঁচা। উচ্চবর্ণ পুরুষরাই ছিলেন তখন সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, নারী ও নিম্নবর্গীয় সমাজ এইসব পুরুষ দাস হওয়ার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করেছেন। সমাজের এইরকম গঠনরীতিতেই তাঁর ছিল তীব্র আপত্তি। এই সমাজের বিরুদ্ধে রামমোহনের সেই সময়ের লড়াই তাই আজও বিস্ময়াবিষ্ট করে রাখে আমাদের। কোন মন্ত্রবলে তিনি ওই সমাজের মধ্যে থেকেও এত আধুনিকমনস্ক হলেন এবং তাঁর পূর্ণাঙ্গ বিকল্প ঘটেছিল নারীমুক্তির ক্ষেত্রে তা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। তার গগনচুম্বী ব্যক্তিত্ব দেখে মনে হয় তিনি সেই সময় ঈশ্বরের প্রেরিত এক দূত হিসাবেই যেন বাংলায় আবির্ভাব হয়েছিলেন।

শুধুমাত্র সতীদাহ প্রথা নিবারণেই তিনি যে কাজ করেছিলেন তাতে আজও তিনি কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে আইন প্রণয়ন না করতে পারলে এই প্রথা নিবারণ করা যাবে না। তাই তিনি ব্রিটিশ শাসককে লিখেছিলেন, বাংলার এই নারকীয় প্রথাটিকে রদ করবার জন্য সমাজে আইন প্রণয়ন করা হোক। রামমোহন রায় ছিলেন ব্রিটিশরাজের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার ব্যক্তি। রামমোহন রায়ের এই আবেদন তাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাঁরাও চেয়েছিলেন সুদূর লন্ডনের ভাইসরয়ের কাছে যাতে এই বাংলা থেকে কোনও বিরূপ মন্তব্য না যায়। ফলে 'সতীদাহ প্রথা' আইন হতে কোনও বাধাই থাকল না। তাঁরা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সতীদাহ প্রথা রদের গুরত্ব অনুভব করেন। ফলে লর্ড বেন্টিংকের সময় ১৮২৯ সালে সতীদাহপ্রথা রদ হয়।

রামমোহন এই বঙ্গ সমাজ তথা ভারতবর্ষের জন্য শুধু এই মহৎ কাজটির জন্যই বিখ্যাত থাকতে পারতেন, কিন্তু তাঁর সেই গুণকেও তিনি

**তিনি ব্রিটিশ শাসককে লিখেছিলেন, বাংলার এই নারকীয় প্রথাটিকে রদ করবার জন্য সমাজে আইন প্রণয়ন করা হোক। রামমোহন রায় ছিলেন ব্রিটিশরাজের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার ব্যক্তি।**

**উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে একটি আবেদনও করেছিলেন। উত্তরপাড়া বা তৎসংলগ্ন স্থানে যাতে একটি বিদ্যালয় সংক্রান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়, তাহলে একটি বিদ্যালয় খুলতে তিনি আগ্রহী আছেন।**

ছাপিয়ে গেছেন তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনার দ্বারা বাংলায় রেনেসাঁসের যুগের সূচনা। সতীদাহ প্রথা রদ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজেও তিনি যে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করে গেছেন, সেই আলোকবর্তিকার ফলেই এই বাংলায় শুরু হয় রেনেসাঁস। এই সময়েই নারীদের উন্নতিকল্পে শিক্ষার কি ভীষণ প্রয়োজন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। শুধু তাইই নয়, তাঁর প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মও সমাজে কম্পন তুলেছিল।

এই সময়ের একদল পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত উদারপন্থী তরুণও এই বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণে উদ্যোগী হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মতো ব্যক্তি। এঁরা এগিয়ে এলেন এই বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা কিভাবে চালু করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার।

তবে বঙ্গ সমাজের বিদ্বজ্জনদের উদ্যোগের আগেই বাংলায় নারী শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারি বা পাদরিরা। কলকাতায় প্রথম মেয়েদের স্কুলের পত্তন ঘটে এঁদের হাত দিয়েই। রবার্ট মে নামে একজন মিশনারি কলকাতায় প্রথম মেয়েদের স্কুল খোলেন। মে নিজের উদ্যোগে এই শহরে স্কুলশিক্ষা চালু করেন। তবে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে নারীশিক্ষা প্রসারণ কিছুটা থমকে যায়। তবে অন্যান্য মিশনারির উৎসাহে আবার দ্রুত কাজ শুরু হয়। সেই সময় উত্তর কলকাতায় বেশ কিছু স্কুল খোলা হয়। এতেই বোঝা যায় মেয়েদের অভিভাবকদেরও কি ভীষণ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল। তবে লক্ষ করা যায় মূলত ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেই এইসব সংস্থা আগ্রহী ছিল। তাই সমাজের কিছু বাঙালি ইন্টেলেকচুয়াল সেই সময় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ নেন। উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের কাছে একটি আবেদনও করেছিলেন। উত্তরপাড়া বা তৎসংলগ্ন স্থানে যাতে একটি বিদ্যালয় সংক্রান্ত অনুমোদন পাওয়া যায়, তাহলে একটি বিদ্যালয় খুলতে তিনি আগ্রহী আছেন। তিনি বলেন, ওই বিদ্যালয়ে বঙ্গ কন্যাগণকে শিক্ষাগ্রহণ, ছবি প্রস্তুত ও সূচীশিল্পে শিক্ষিত করবে। নিজ ব্যয়ে, নিজ জমিতে ওই বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু সরকার তাঁর এই উদ্যোগকে খুব একটা আমল দেননি। যদি জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজ অঞ্চলে ওই বিদ্যালয় পত্তন করার অনুমতি পেতেন তবে সেটিই হত ভারতবর্ষের প্রথম নারী শিক্ষা মন্দির। কিন্তু যে কোনো অজ্ঞাতকারণেই হোক এই বিদ্যালয় ওই স্থানে পত্তন হওয়ার কোন অনুমতি তিনি পেলেন না। আসলে তৎকালীন বিদ্বজ্জনেরা সেইসময় দুটি ভাগে বিভক্ত ছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার জন্য কিছু বিদ্বজ্জন ছিলেন একটু বেশিমাত্রায় ব্রিটিশ মুখাপেক্ষী। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সম্ভবত তাই ঘটেছিল।

তবে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সময়েই ১৮৪৮ সালে বড়লাটের আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে আসেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। সরকার থেকে তাকে কিছুদিনের মধ্যেই নিযুক্ত করা হয় শিক্ষা সেলে। বেথুন সেই সময়ে বাংলায় এসে অনুভব করেন শিক্ষার অভাবে বাঙালি মেয়েদের দৈন্যদশার ব্যথা। বেথুন পরিকল্পনা করেন তিনি স্কুল শুরু করবেন। সেই স্কুলে মূলত বাঙালি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরাই পড়ার সুযোগ পাবে। বাংলা ভাষাতেই সেই স্কুলে পঠন-পাঠন হবে। আর স্কুলটি হবে অবৈতনিক। কিন্তু স্কুলের ছাত্রী কোথা থেকে পাওয়া যাবে?

কারণ সমাজ তো পরিবর্তিত হয়নি। সমাজে তখন প্রাচীন গোঁড়া হিন্দুত্ব পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। সংস্কৃত টুলো পণ্ডিতরা এমনিতেই রামমোহনের সতীদাহ প্রথা রদ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তবে এটাও ঠিক যে তাঁরা আইনের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তাহলেও সমাজের এই বড় অংশ নারী শিক্ষার ব্যাপারে মোটেও যে সমর্থন করবেন না তা জানতেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দ্বারকনাথ গুপ্তর মতো স্ত্রীশিক্ষা সমর্থকরা। ১৮৪৯ সালে কলকাতায় প্রথম স্ত্রী শিক্ষাকে কেন্দ্র করে শুরু হল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল। অবাক লাগে ভাবতে যখন দেখি ওই স্কুলের ছাত্রী কারা ছিল ? এইসব শিক্ষিত নব্যবঙ্গীয় পরিবারের মেয়ে, বোন, দিদিরাই। দূর থেকে যেসব মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসবে, তাদের জন্য ব্যবস্থা থাকবে স্কুলগাড়িরও। সকালে স্কুল শুরু হবে। প্রথমদিকে এই বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ২১ জন। এই ২১ জন ছাত্রীই যেন একুশটি পত্রে পল্লবিত হয়ে পরবর্তীকালে স্কুলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করল।

বেথুন ও তৎকালীন বাংলার চিন্তাবিদরা যে ঢিল ছুঁড়লেন তার তো প্রতিক্রিয়া হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হল না। যাঁদের ঘর থেকে ছাত্রীরা স্কুল আসতে শুরু করল, তাঁরা সমাজে একঘরে হলেন। লোকেরা এইসব বিদ্বজ্জনের প্রতি তীব্র ঘৃণা, কটূক্তি বর্ষণ করতে লাগল। তৎকালীন বড়লাট বেথুন শুধু বিদ্যালয় স্থাপন করে বসে থাকেননি, তিনি প্রতিদিনই অজস্র কাজের ফাঁকে স্কুল পরিদর্শন করতেন। ছোট ছোট ছাত্রীর তিনি নানা আবদার মেটাতেন। এমনকি মদনমোহনের দুই মেয়ে ভুবনমালা আর কুন্দমালাকে কোলে নিয়ে তিনি প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন। নারী শিক্ষার প্রসারণে বেথুনের অবদান বলে প্রবন্ধকে দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। তিনি ব্যতীত কলকাতায় বাংলা শিক্ষায় মহিলারা কতটা সুফল লাভ করতেন তা বলা মুশকিল। বেথুন প্রায় নিজের জীবন দিয়েই বাংলার নারী শিক্ষাকে এককভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নিজের চেষ্টায় জমি সংগ্রহ করে মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছেন। তিনি স্বপ্ন দেখতেন মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় হবে, জমি সংগ্রহ করে স্কুলের কাজও শুরু হয়, কিন্তু এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই বেথুনের অকালমৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পরে দেখা যায় তিনি তাঁর সম্পত্তির প্রায় হাজার তিরিশ টাকা স্কুলকে দান করে গেছেন। ইউরোপিয় সমাজে বেথুনের মতো স্বার্থহীন মানুষ খুব বেশি আসেননি। বাংলাদেশের স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রদর্শক ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এই বাঞ্ছার মধ্যে কোনও স্বার্থ জড়িত ছিল না। খ্রিস্টান হয়েও তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রচার করেননি, ইউরোপিয় সমাজে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতা অপব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে হতভাগ্য, পরাধীন ভারতের সবচেয়ে অত্যাচারিত, ঘৃণিত, দলিত, পেষিত, অন্ধকারাচ্ছন্নময় জগতে কুসংস্কারাচ্ছাদিত মূক স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি যে ঋণ রেখে গেছেন আজ বাংলা সমাজ তা ভুলে গেছে। বেথুন কি শুধু ইউরোপিয় বলেই আমরা বিস্মৃত হয়েছি, বেথুনকে জানা বা চেনার কোনও চেষ্টা কি আজকের বাঙালি সমাজ বিশেষত ছাত্র-মহলে আছে?

রামমোহন বা বেথুনের কথা বলে শেষ করা যাবে না। বেথুন ইংরেজ হয়েও বাঙলার নারীদের ব্যথা যেভাবে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। বেথুন বা রামমোহনের শিক্ষার উদ্যোগ হয়তো

খ্রিস্টান হয়েও তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রচার করেননি, ইউরোপিয় সমাজে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই ক্ষমতা অপব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে হতভাগ্য, পরাধীন ভারতের সবচেয়ে অত্যাচারিত, ঘৃণিত, দলিত, পেষিত, অন্ধকারাচ্ছন্নময় জগতে কুসংস্কারাচ্ছাদিত মূক স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি যে ঋণ রেখে গেছেন আজ বাংলা সমাজ তা ভুলে গেছে।
বেথুন কি শুধু ইউরোপিয় বলেই আমরা বিস্মৃত হয়েছি, বেথুনকে জানা বা চেনার কোনও চেষ্টা কি আজকের বাঙালি সমাজ বিশেষত ছাত্র-মহলে আছে?

রাজা রামমোহন রায় রেনেসাঁসের যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রদীপের আলোই সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। আর সেই জন্যই বাংলার স্ত্রী শিক্ষার কথা উঠলেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো রামমোহন বিদ্যাসাগরের কথা একসঙ্গে ওঠে।

তাঁদের মৃত্যুর পরেই পথ হারাত যদি না তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এক সিংহ এ বাংলায় আসতেন। রামমোহনের অবস্থানকালের দু'দশকের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলার মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এমন এক পুরুষ যিনি সমগ্র বাংলার নারীজাতির উন্নতির জন্য এক উদাহরণ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরের পূর্বে রামমোহন বাংলার নারীজাতির উন্নতির জন্য যে প্রদীপ প্রজ্বলন করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেই আলোকরশ্মিকেই যেন অগ্নিশিখায় পরিণত করলেন। রাজা রামমোহনের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের বিস্তর আর্থ-সামাজিক ব্যবধান ছিল। দুজনেই যদিও ছিলেন বিদ্যাচর্চার প্রতি সমান আগ্রহী, তবে জমিদার বাংলার রক্ত রামমোহনের দেহে প্রবাহিত হলেও ঈশ্বরচন্দ্রদের পরিবার ছিল সনাতন পরিকাঠামোয় মোড়া, ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ি ছিল গোঁড়া হিন্দু পরিবার। সেই পরিবারের মধ্যে বড় হওয়া বিদ্যাসাগরের মন কিভাবে বঙ্গীয় নারীদের অবস্থান দেখে কেঁদে উঠল তা সত্যিই বিস্ময়ের। তবে এটা তো ঠিক যে বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রায় পুরোটাই কেন্দ্রীভূত ছিল বঙ্গনারীদের উন্নতির প্রতি। তাঁর সময়ের এই মেয়েরা কারা, কেমন ছিল তাঁদের সামাজিক, পারিবারিক অবস্থান ? আজকের একবিংশ শতাব্দীতে বসে সেই নারীদের দুঃখ-কষ্ট, অত্যাচারের মাত্রা বোঝা সহজ কর্ম নয়। আজকের বঙ্গনারী কি শিক্ষায়, কি দীক্ষায়, কি মননে, কি বিজ্ঞানে, কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি মেধায় সারা ভারতবর্ষ ছাপিয়ে যেভাবে পৃথিবীর সব প্রান্তে, তাঁর যোগ্যতার জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলেছেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে সেই ভাবনা ছিল দূর অস্ত। তাহলে প্রশ্ন জাগে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিরকম সমাজ ছিল? কিরকম ছিল সেই সময়ের মেয়েরা?

'ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসংস্কারের প্রতি মনোযোগী হবার কারণ হিসাবে আমার মনে হয়, এই সমাজে নারীদের চরম দুর্দশায় তাঁর মন কেঁদে ছিল। এটা সবৈব সত্য, তবে তিনি বঙ্গনারীদের যে শ্রেণীর দিকে তাঁর দৃষ্টিকে প্রোথিত করেছিলেন তাঁরা হলেন সমাজের শিশুকন্যারা। ঈশ্বরচন্দ্রের বিজয়গাথা বলতে গেলে বলতে হয় বিধবা বিবাহ রোধের বিরুদ্ধে তিনি যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেও ওই শিশুকন্যাদের কথা ভেবেই।' প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর বই Provincializing Europe-এ এই কথাই বারে বারে বলেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনে যে কঠিন কাজটি হাসিমুখে করতে পেরেছিলেন, সেটি হল 'বিধবা বিবাহ' প্রচলন করা। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা দাবি করতেই পারে তাঁর সময়ে রেনেসাঁসের ফলে বাংলার এই ঘটনাটি শুধু এক নতুন দিনের জন্ম দিয়েছে তা নয়, এই বিশাল সমাজসংস্কার বাংলার প্রাণকেই যেন পুনর্জন্ম দিয়েছে, এটি একটি বিশাল তাৎপর্যপূর্ণময় কথা।' রাজা রামমোহন রায় রেনেসাঁসের যে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে চলে গেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেই প্রদীপের আলোই সারা বাংলা তথা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। আর সেই জন্যই বাংলার স্ত্রী শিক্ষার কথা উঠলেই নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মতো রামমোহন বিদ্যাসাগরের কথা একসঙ্গে ওঠে।

রামমোহন প্রবর্তিত সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলনের প্রায় দু-দশক পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন আন্দোলন শুরু করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যে ছবি আমরা দেখি, তা হল মাথায় টিকি, গায়ে চাদর, পায়ে খোলা চটি। এই ছবি দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় তিনি

প্রাচীন সনাতনপন্থী দলের প্রতিনিধি। কিন্তু তা প্রমাণিত হল কি? ওই গোঁড়ামি কাঠামোকে দূরে সরিয়ে রেখে তিনি বাংলা সমাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন বিধবা-বিবাহ প্রথা চালু করার জন্য। সেই সমাজের ছবি কী ছিল? বিদ্যাসাগর দেখেছেন তাঁর পূর্বসুরি রামমোহনের এক আকাশচুম্বী কাজ সতীদাহ প্রথা রদ আইন মোতাবেকে চালু হয়ে গেছে। ফলে বাল্যবিধবাদের সতী হওয়ার পথে কাঁটা পড়েছিল। কিন্তু এই ছোট ছোট বাল্যবিধবা কন্যাকে দেখে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠত। তাঁর চোখের সামনেই ঘটে গেছে অকাল বিধবা শিশুকন্যার জীবনে চরম দুর্দশা। এইসব শিশুকন্যার জীবন থেকে যেন কেউ সব আলো শুষে নিয়েছে। তারা সেই অন্ধকার জীবনে কোথায় কোন অতলে তলিয়ে যেত, সেটা কেউ জানে না। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এই শিশুকন্যাদের যদি সমাজের মূলস্রোতে



ফিরিয়ে দিতে হয় তাহলে পূর্বে এদের পুনর্বিবাহ দিতে হবে। এঁদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে না দিলে সমাজের ভারসাম্যই নষ্ট হবে। আর তাই হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে তিনি দেখলেন সেখানে স্পষ্ট করে কী লেখা আছে? সেখানে বলা আছে...

'নষ্ট মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ,
প্রাপঞ্চস্বাপ্যসু নারীনাং পতিবননা বিধীয়তে।'

অর্থাৎ হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ বৈধ। তিনি চাইলেন আগে এ ব্যাপারে সমাজকে সচেতন করতে হবে। নিজ খরচে তিনি ছোট ছোট পুস্তিকা ছাপালেন বিধবা-বিবাহর পক্ষে। এই পুস্তিকার চাহিদা ক্রমে বেড়ে যায়। তিনি আবার এবং বারবার ছোট ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন এবং নানাভাবে জনমত তৈরির চেষ্টা করতে থাকেন। এই জনমত মূলত মেয়েদের অধিকার ও শিক্ষার সমর্থনে লেখা। এইভাবে জনমত গঠনের মূল কারণ কী ছিল? ঈশ্বরচন্দ্র চেয়েছিলেন তৎকালীন সমাজে পুরুষদের কৌলীন্যপ্রথার দোহাই দিয়ে বহু বিবাহর যে রীতি ছিল তা বন্ধ করা আর হিন্দু সমাজে পুরুষদের সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যেভাবে শিশুকন্যারা বলি হত তা দূর করা। বিদ্যাসাগরের এই উদ্যোগ যে রক্তচক্ষু সমাজ মোটেই ভালো চোখে নেবে না, তা বলাই বাহুল্য। আর এইজন্য বিদ্যাসাগরকে কম লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন বিধবাবিবাহ আইনগতভাবে সিদ্ধ হোক। আর সেই জন্যই তিনি জোর দেন সমাজের বিশিষ্টজনেদের মধ্যে জনমত তৈরি হোক। তাঁর ওই ছোট ছোট পুস্তিকা সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাতে হাতে পৌঁছে গেল। তৈরি হয় বিধবা-বিবাহর সপক্ষে জনমত। বিদ্যাসাগর সমাজের কয়েকশো দিকপাল ব্যক্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে একটি আবেদন করেন। এই আবেদন সরকারের কাছে তিনি জমা দেন ১৮৫৫ সালে, তার পরের ঘটনা তো ইতিহাস। ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র চেয়েছিলেন তৎকালীন সমাজে পুরুষদের কৌলীন্যপ্রথার দোহাই দিয়ে বহু বিবাহর যে রীতি ছিল তা বন্ধ করা আর হিন্দু সমাজে পুরুষদের সামাজিক পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য যেভাবে শিশুকন্যারা বলি হত তা দূর করা।

**সাধারণ মনুষ্য চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তফাত ছিল এইটুকুই তাঁর দুর্জয় সাহস, অলঙ্ঘনীয় জেদ, স্ত্রীজাতির প্রতি অপ্রতিরোধ্য বাৎসল্য, এসবই তাঁকে চিরকালীন করে তুলেছে।**

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর যে স্বার্থহীন উদ্যোগ এই উদ্যোগকে কার সঙ্গে তুলনা করা যায়? বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কোনও ব্যক্তির সঙ্গে তো নয়ই, কারণ তার গগনচুম্বী সাহস ও মানসিক ঔদার্য তাঁকে সমাজের যে উচ্চাসনে বসিয়েছিল তার সমতুল ব্যক্তি কেউই সেই সময়ে ছিলেন না। বিদ্যাসাগরের জীবনের এইদিকগুলিই হল, আমাদের বঙ্গসমাজের নারী শিক্ষা প্রচলনের এক-একটি সোপান। কোনও রাজনৈতিক দল নয়, কোনও ধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে জড়িত নয়, অথচ এই একগুঁয়ে পুরুষটি শুধুমাত্র সমাজসংস্কার করার জন্য সমাজের দুর্বলতম শ্রেণিকে যেভাবে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মন্ত্র দিয়ে গেছেন, বাঁচার প্রেরণা দিয়েছেন, তাতে সত্যিই তাঁকে 'মসিহা' মনে হয়। সেই জন্যই তিনি ছিলেন যুগোত্তীর্ণ পুরুষ। তিনি স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন যখন বেথুন স্কুল প্রচলন করেন তখন সর্বাগ্রে তিনি আর তাঁর পরম বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বেথুনকে পূর্ণ সমর্থন করে তাঁর পাশে দাঁড়ান। বিধবা বিবাহর ক্ষেত্রেও তাই তিনি শুধু আইনকে পরিণত করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বেশ কিছু বাল্যবিধবাকে নিজ খরচে উদারচেতা পুরুষের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

সাধারণ মনুষ্য চরিত্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের তফাত ছিল এইটুকুই তাঁর দুর্জয় সাহস, অলঙ্ঘনীয় জেদ, স্ত্রীজাতির প্রতি অপ্রতিরোধ্য বাৎসল্য, এসবই তাঁকে চিরকালীন করে তুলেছে। শোনা যায় তার জীবদ্দশাতেই শান্তিপুরের তাঁতিরা তাঁর নামে শাড়ি তৈরি করতেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই বাংলার ঘরে ঘরে মা-বোনেদের এই বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়ির তৈরি জনপ্রিয়তা বুঝিয়ে দেয়, তাঁর নারীজাতির প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা ছিল। আর বাংলার ওই পিছনে পড়ে থাকা নারীরাও তাঁকে কোন উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই শাড়িতে পাড়ে লেখা থাকত, 'বেঁচে থাকো বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে...'।

এই প্রসঙ্গে হয়তো অনেকে জানতে আগ্রহী হতে পারেন বিদ্যাসাগর কোন ধরনের শিক্ষা বাংলার মেয়েদের দিতে চেয়েছেন, বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র মেয়েদের শিক্ষার জন্য কি কোনও পৃথক শিক্ষার খসড়া করতে চেয়েছিলেন? যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর দেখিয়েছেন তাঁর স্বপ্নে এমন স্ত্রীশিক্ষার খসড়া আছে যাতে কন্যাশিশুরা শুধুমাত্র সূচি শিল্পে আর আবদ্ধ থাকবে না। তিনি চেয়েছিলেন এমন শিক্ষা, যাতে নারীদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, বিদ্যাসাগরের সময়েও মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করতেন। কিন্তু তা ছিল মূলত উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঠাকুরবাড়ি অর্থাৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবার গভর্নেন্স রেখে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হত। এই পরিবার সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মধ্যে পড়ে, ফলে তাঁদের শিক্ষার সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা এবং কালচারের বিশেষ তফাত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মূলত বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের শিশুকন্যা বা নারীদের কথাই ভেবেছিলেন। তাই মেয়েদের জন্য সার্বিক শিক্ষার কথাই ভেবেছিলেন। যাতে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্যই শিক্ষা পদ্ধতি এবং পাঠক্রম একই থাকে। মেয়েরা যাতে লিখন-পঠন, পাটিগণিত, জীবনচরিত, ভূগোল, বাংলার ইতিহাস, নানা বিষয়ে মৌখিক পাঠ ও সেলাই শিক্ষা, সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় নিতে পারে সেদিকে তীব্র নজর ছিল। পরবর্তীকালে ১৮৭৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে স্ত্রী-পুরুষকে একই সঙ্গে পরীক্ষায়

বসতে দেওয়ার অনুমতি দিলেন তার জন্য বিদ্যাসাগরের এই দূরদর্শিতা কাজ করেছিল। এই শিক্ষাগ্রহণ শুরু হলে কন্যাশিশুরা মানসিকভাবে কতখানি দৃঢ় ও পড়াশোনা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কতটা আগ্রহী তা বোঝা গিয়েছে বিভিন্নভাবে মেয়েদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সমাজের সামনে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ দেখানোয় মেয়েরা যখন একাধারে শিক্ষার স্বাদ পেতে শুরু করে, তখন তাদের নিজেদের ভিতরের প্রতিভারও স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। বহু বাঙালি মেয়ে তাঁদের পারিবারিক আবহাওয়াতেই শিক্ষা নিতে শুরু করেন। এই রকম এক মহিলা হলেন রাসসুন্দরী দেবী।

বিদ্যাসাগর সর্বসাধারণের জন্য স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। সমাজের এক বড় অংশ আদৌ চাননি, মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পৃথক কোনও স্কুলে পড়াশোনা শিখুক। তিনি এঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। সমাজের রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন শহরতলিতে নারীশিক্ষা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ১৮৪৯-এ বেথুন স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হল, তখন সাধারণ বাঙালি সমাজে 'স্ত্রীশিক্ষা' যথার্থ শুরু হল। ১৮৪৯-এর আগে ১৮৪৭ বারাসাতের কিছু বিদ্বোৎসাহীর উদ্যোগে একটি মেয়েদের বিদ্যালয় তুলতে পারেনি। তবে ওই স্কুলকে চোখের সামনে দেখে শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকান্তদেব বা উত্তরপাড়ার রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়রা কলকাতা এবং উত্তরপাড়ায় নারীশিক্ষা বিদ্যালয় খুলতে উৎসাহী হয়েছিলেন। এরপর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শিশুকন্যাদের জন্যে বিদ্যালয় খোলার খবর আসতে আরম্ভ করে। জানা যায়, বর্ধমানের রাজারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। শিক্ষা খাতে বহু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দান করেন। ধীরে ধীরে দেখা যায়, অবিভক্ত বাংলায় শহর এবং শহরতলির মেয়েদের বহু স্কুল খোলা শুরু হল। দলে দলে ওইসব শিশুকন্যার অভিভাবকগণ মেয়েদের শিক্ষিত করবার সদিচ্ছায়, মেয়েরা স্কুলে নিয়মিত যেতে আরম্ভ করল। বিদ্যাসাগর মহাশয় চেয়েছিলেন, সরকারি অনুদান যাতে স্কুলগুলিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তা না পাওয়ায় স্কুলগুলো আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়ে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এতে তিনি খুবই ব্যথিত, ক্ষুব্ধ হন। তাঁর সেই সময়ের লেখা পড়লে জানতে পারা যায়, শাসকদের উদাসীনতায় তিনি কি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর সর্বসাধারণের জন্য স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এই স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন করতে তাঁকে কম বেগ পেতে হয়নি। সমাজের এক বড় অংশ আদৌ চাননি, মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পৃথক কোনও স্কুলে পড়াশোনা শিখুক। তিনি এঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। সমাজের রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কলকাতা ও তৎসংলগ্ন শহরতলিতে নারীশিক্ষা বিদ্যালয় গড়ে ওঠে।

এ ব্যাপারে একটি বিষয়ের উপর দৃষ্টিপাত না করলেই নয়, ঈশ্বরচন্দ্রের সেই সময়কার পুরুষ বিদ্বজ্জনদের স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে উৎসাহী

রাসসুন্দরী দেবীর সময়কাল (১৮১০-১৮৯৯)। তাঁর 'আমার কথা' রচনাটি মেয়েদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের এক জ্বলন্ত দলিল। তাঁর 'আমার কথা' নামক পুস্তকটি থেকে জানা যায় পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। সেইখানে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তিনি অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন।

হয়ে সমাজের বহু মেয়ে-বউরাও এগিয়ে আসেন। বাঁকুড়ার রাধিকাসুন্দরী, বর্ধমানের করুণাময়ী দেবী, পাবনার বামাসুন্দরী, এছাড়াও বহু মহিলা নিজ উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে রত হন।

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি আকর্ষণ করার প্রয়োজন আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্ন ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিত্বর মতো পণ্ডিতরা যখন বাঙালি হিন্দু সমাজের শিশুকন্যাদের জন্য প্রাণপাত করেছিলেন, বাংলার মুসলমান সমাজ কিন্তু এ ব্যাপারে নীরব ছিল। এ ব্যাপারে তাঁদের বহুবার চেষ্টা করেও ঘরের বাইরে বের করা যেত না। মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি বা কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যেভাবে গভীরে প্রোথিত ছিল, তাতে এইটুকু বলা যেতেই পারে, সেই অবরোধ প্রথা ভাঙা খুব সহজ ছিল না। তবুও প্রাপ্ত রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় তাহেরণলেছা নামে এক কন্যার বাড়ি থেকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনিই সম্ভবত প্রথম মহিলা যিনি বাঙালি মুসলিম হিসাবে স্কুলে যাতায়াত করতেন। পরে ইনি বহু পত্র-পত্রিকায় লিখে নিজেকে একটি যোগ্য জায়গায় পৌঁছে দেন। পরে মুসলিম সমাজের মেয়েরা ক্রমেই শিক্ষালাভের ইচ্ছায় এগিয়ে আসেন।

বাংলার তিনিই সম্ভবত প্রথম মেয়ে যিনি আত্মজীবনীমূলক রচনা লিখেছিলেন। রাসসুন্দরী দেবীর সময়কাল (১৮১০-১৮৯৯)। তাঁর 'আমার কথা' রচনাটি মেয়েদের স্ত্রীশিক্ষা প্রসারণের এক জ্বলন্ত দলিল। তাঁর 'আমার কথা' নামক পুস্তকটি থেকে জানা যায় পূর্ববঙ্গের একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। সেইখানে বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের বিদ্যাশিক্ষার পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তিনি অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর তিনি নিজে আমৃত্যু বিদ্যাচর্চা করে গেছেন তাঁর 'আমার কথা' বইটি বিদ্যার্চনার ক্ষেত্রে কোনও আলোচনার পূর্বে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে বলি। এই বইটি পড়লে জানা যায় মেয়েদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কতখানি অভীপ্রাসী ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিলারা শিক্ষালাভ করে সমাজের এক অতীব সম্মানের জায়গা লাভ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই নাম করতে হয় কাদম্বিনী গাঙ্গুলির। তিনিই প্রথম বাঙালি তথা ভারতীয় মহিলা যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম গ্রাজুয়েট হন। শুধু তাই নয়, গ্র্যাজুয়েশনের পরেও তিনি তাঁর বিদ্যার প্রতি অনুরাগ থামাননি। তিনি এর পরেও পড়াশোনা চালিয়ে যান এবং প্রথম মহিলা ভারতীয় ডাক্তার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু তাই-ই নয়, তিনিই প্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যেও প্রথম ভারতীয় মহিলা ডাক্তার। কাদম্বিনী দেবী বাংলার অত্যন্ত কৃষ্টিশীল পরিবারের মেয়ে ছিলেন। কলিকাতার এক অভিজাত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্ম পরিবারের মহিলা বলেই তিনি নিজের যোগ্যতায় এতখানি সফল হয়েছিলেন কিনা জানি না। দেখা গেল, মেয়েরা ক্রমেই বদ্ধ জলাশয় থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। মেয়েরা যত বেশি করে লেখাপড়ার স্বাদ গ্রহণ করতে শিখল, ততই তাদের নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে বেরোতে লাগল। সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান-সংগীত অভিনয়–এমনকি রাজনীতিতেও মেয়েরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে দ্বিধা করল না। ঈশ্বরচন্দ্র মেয়েদের মনে যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, সেই আলোর পথ ধরেই মেয়েরা অগ্নিশিখায় পরিণত হল।

সেই অগ্নিশিখাই শতধারূপে ছড়িয়ে গেল বিংশ শতাব্দীতে। বিংশ শতাব্দীর প্রান্তেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা জয় করে ইংল্যান্ড থেকে খুঁজে এনেছিলেন এক সিংহীকে—তাঁর নাম মার্গারেট নোবেল। পরবর্তীকালে স্বামীজী 'নিবেদিতা' নাম দিয়ে তার স্কন্ধে ন্যস্ত করেছিলেন বঙ্গনারীসমাজের শিক্ষা বিস্তার। এক বিদেশিনী কিভাবে আমাদের জীবনবোধের প্রতি ছত্রে ছড়িয়ে গেলেন তার এক বিশাল ইতিহাস আছে। আমৃত্যু তিনি সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে নিজের কাছে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নারীশিক্ষার বিস্তারের ইতিহাসে তাঁর নাম মোটেই বিস্মরণের তালিকায় পড়ে না। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই খ্রিস্টান মহিলারা বাংলায় শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন, তবে সিস্টারের অবদানের গল্প অন্য রকমের।

বিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষা বিস্তারের ফল পেতে শুরু করেছিল বঙ্গসমাজ। এই শতকের প্রায় মাঝামাঝি ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে। এই আন্দোলনে বাংলার মহিলাদের যে বিশাল অবদান তা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি আজকের দেশের জনগণ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের যোগদান যে শিক্ষার আলোর ছোঁয়াতেই সম্ভব, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। এই মহিলারা সরাসরি প্রত্যক্ষ আন্দোলনে বিশাল ভূমিকা নিয়েছিলেন। নির্বিচারে স্ত্রী-পুরুষকে যেভাবে ব্রিটিশ শাসকরা অত্যাচার করেছে, সেটা সারা বিশ্বেই নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ মহিলাদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসতে পথ পরিষ্কার করে।

আর এই একবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের সম্মান ও যোগ্যতা কোন উচ্চতায় পৌঁছেছে তা বোঝাই যায়। ২০১১ সাল থেকে এই বাংলাতেও তৈরি হয়েছে নতুন ইতিহাস। পশ্চিমবঙ্গে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের অন্যতম সফল ফসল কন্যাশ্রী। ২০০৬ সাল থেকে মেয়েদের বিয়ের বয়স ন্যূনতম ১৮ এবং ছেলেদের ২১ বছর করা হয়েছে আইনের মারফত। শিশুকন্যা বিবাহর রোধে যে লড়াই শুরু হয়েছে বহু শতাব্দী পূর্বে, তা বিলোপ দেশের সমাজের সর্বস্তরে এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এই সরকারের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প আমাদের সমাজের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সরকার থেকে শিশুকন্যার ১৩ থেকে ১৮ বছর অবধি ছাত্রীদের এককালীন বার্ষিক স্কলারশিপের প্রথা চালু করেছে। এছাড়া ১৮ থেকে ১৯ বছরের কন্যাদের এককালীন ২৫,০০০ টাকা অনুদান দিতে শুরু করেছে। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিশুকন্যা বিবাহ রোধ ও শিক্ষার প্রসার কন্যা সমাজে। সদ্য নতুন এই প্রকল্প যে এক যুগান্তকারী সুদূরপ্রসারী ফসল, আজ তা বলাই বাহুল্য। আগামী দিনে যদি বাস্তবে সত্যিই এমন ঘটে আর এখানে একটি শিশুকন্যাও নিরক্ষর নেই, আর একজনও শিশুকন্যা বিবাহ নামক যূপকাষ্ঠে বলি হচ্ছে না, বাংলার গর্ব তখনই সার্থক হবে। সফল হবে আমাদের পূর্বসূরিদের লড়াইও। তখনই সম্ভবত রাজা রামমোহন বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জানানো হবে।

বিংশ শতাব্দীতে নারীশিক্ষা বিস্তারের ফল পেতে শুরু করেছিল বঙ্গসমাজ। এই শতকের প্রায় মাঝামাঝি ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে। এই আন্দোলনে বাংলার মহিলাদের যে বিশাল অবদান তা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি আজকের দেশের জনগণ। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মহিলাদের যোগদান যে শিক্ষার আলোর ছোঁয়াতেই সম্ভব, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই।

**গ্রন্থঋণ :** ১। রাজা রামমোহন রায়—নারীর অধিকার
২। অন্নদাশংকর রায়—রাজা রামমোহন
৩। দীপেশ চক্রবর্তীর—Provincializing Europe
৪। স্বপন কুমার বসু—ঊনিশ শতকের বাংলা সমাজ।

# বিদ্যাসাগর অন্বেষণে

## দীপেন্দু চৌধুরী

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে, আর দেশের মানুষ চোখ বুঁজে 'ভগবান' 'ভগবান' করবে— এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আছে মাটির পৃথিবীতে, স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, বারে বারে ফিরে আসি এই মর্ত্য বাংলায়।"

বাংলার নবজাগরণের পথিকৃৎ তিনি। অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অখ্যাত বীরসিংহ গ্রামের ব্রাহ্মণ টোলের পরিবার থেকে বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। সে সময় সুদূর বীরসিংহ গ্রাম থেকে কলকাতায় যাতায়াতের পরিবহণ ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। কেবলমাত্র পালকি করে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল গরুর গাড়ি। বিদ্যাসাগরদের পরিবারের তখন পালকি বা গরুর গাড়ি রাখার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। কথিত আছে, তাই পায়ে হেঁটে মাইলস্টোন গুনতে গুনতে কলকাতায় আসেন বিদ্যাসাগর। ইতিহাস লেখার আগে ইতিহাস হয়ে উঠতে থাকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'বর্ণপরিচয়'-র গোপাল-রাখালের গল্প। ঋজু এবং দৃঢ় চরিত্রের ব্যক্তি বিদ্যাসাগর অন্যায়ের সঙ্গে কোনওদিন সমঝোতা করেননি। বিদ্যাসাগরের জন্মের প্রায় ২০০ বছর পরে আজ আমরা আরও বেশি করে উপলব্ধি করতে পারছি তাঁর জীবনব্যাপী কর্মের গুরুত্ব। অনুভব করতে পারছি তাঁর সমাজ সংস্কার বিষয়ে আন্তরিক পদক্ষেপ।

১৩২৯ সালের ১৭ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেইটেই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।'

"রবীন্দ্রনাথের এ-কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষ, অক্ষয় মনুষত্ব এবং সমাজ সর্বস্ব চৈতন্যই হল বিদ্যাসাগরের সত্যকার পরিচয়। দয়াও নয়, বিদ্যাও নয়, জীবনে তাই ঈশ্বরচন্দ্র কোনোদিন 'সমাজ' ও 'মানুষ' ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন হতে পারেননি। এই না-পারাটাই বড় কথা" (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ, পরিবার, পৃষ্ঠা- ৩/৪)

রবীন্দ্রনাথ এবং বিনয় ঘোষ দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের কাজকে কোনও মহৎ কাজ বলে এক কথায় নির্বাসনে

পাঠাতে চাননি। তাঁর কাজের ধারা, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক সংঘাতকে আন্তরিকভাবে নিজেদের বয়ানে, আমাদের সামনে এনে দিয়েছেন। আমরা সেই গল্পের প্রসঙ্গ নতুন করে উত্থাপন করতে নয়, যে বিষয়টা আমাদের আজও শিক্ষার জগতে সামনে থেকে দেখতে আহ্বান জানায়, সেটা হচ্ছে, 'বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে'। চাণক্য শ্লোকে আছে, বিদ্যা আর রাজপদ কভু তুল্য নয়,/ উভয়ের মধ্যে বহু ভেদ দৃষ্ট হয়।/ কেবল নিজের রাজ্যে রাজার সম্মান,/ সকল দেশেতে পূজ্য যে জন বিদ্বান।। (সূত্রঃ কৃষ্ণচন্দ্র কাব্যতীর্থ-সঙ্কলিত চাণক্য শ্লোক, পৃষ্ঠা-১) বিদ্যা শিক্ষা নিয়ে বিভিন্ন মতামত অতীতে থাকলেও উত্তর 'বিদ্যাসাগর' যুগে 'বিদ্যা বিনে গীত নায়' আমরা মেনে নিয়েছি। সেই মেনে নেওয়াটা শিখিয়ে গেছেন বরেণ্য সমাজ শিক্ষক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আরও একটা জনপ্রিয় প্রবাদ সমাজে চালু আছে, 'লেখা পড়া করে যেই গাড়ি ঘোড়া চড়ে সেই'। বিদ্যাসাগর পায়ে হেঁটে, অক্লান্ত মানসিক শক্তি নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতায় এসেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা তখন সংস্কৃত টোলে বিদ্যা দান করাকে পুণ্য কাজ বলে মনে করত। যে সব পণ্ডিতরা এই কাজ করতেন তাঁদের সামাজিক সম্মান থাকলেও আর্থিকভাবে নিজেদের পরিবারে অনটন লেগেই থাকত।

অনাহার, এক বস্ত্রে সারা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার মতো অভাবী গরিব পণ্ডিত আদর্শ শিক্ষকদের আখ্যান এই সেদিন পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে পড়েছি। এবং আমাদের ছোট বেলায় আদর্শ শিক্ষকদের কষ্টে দিন যাপন করতে দেখেছি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও তাঁরা শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষাকে মহানব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিত তথা গুণীজনেরা বিভিন্ন সময়ে লিখে গেছেন। বাঙালি সমাজে, অবিভক্ত ভারতে নারীশিক্ষার বিষয়টা একেবারেই অবহেলিত ছিল। কুসংস্কার হোক অথবা পুরুষ শাসিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের তথাকথিত অহংকার। আমরা যে ভাবেই দেখি না কেন, নারী শিক্ষার ব্যাপারটা কয়েক দশক আগেও কলকাতার বনেদি পরিবারেরা মেয়েদের কাছে ছিল অন্যায়। তাঁরা রক্ষণশীল পরিবারের পর্দানসীন বনেদী বাড়ির মা, মাসিমা, মেয়ে, বৌ হয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। পুরুষশাসিত রক্তচক্ষু সমাজে সবরকমের সীমাবদ্ধতা নিয়ে অভিজাত পরিবার ছিল তাঁদের কাছে পুতুল খেলার ঘর। শিক্ষার আলোর জন্য তাঁদের বারদুয়ারে যাওয়া মানে 'লক্ষণরেখা' পার হয়ে যাওয়া।

এই নিবন্ধের জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষদের বিদ্বজ্জনের মতামত নিয়েছি। সেই তালিকায় কবি সুস্মেলী দত্ত আছেন। সুস্মেলী উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির কাছে বিখ্যাত লাহা পরিবারের মেয়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার স্নাতক সুস্মেলী দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেন, তিনি নিজেদের পরিবারে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। লাহা, দত্ত, উত্তর কলকাতার এইসব বণিক তথা বনেদী পরিবারের মেয়েদের একটা সময়ে স্কুল কলেজে যাওয়ার ক্ষেত্রে ঘোষিত

আমাদের ছোট বেলায় আদর্শ শিক্ষকদের কষ্টে দিন যাপন করতে দেখেছি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেও তাঁরা শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষাকে মহানব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে এদেশের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত বিদ্যার যোগসূত্র স্থাপন এবং বাংলা শিক্ষা প্রচলন শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি হল বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি। তাঁর অন্য কীর্তি হল, এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা।

নিষেধাজ্ঞা ছিল। অবশেষে স্কুল কলেজে পড়ার অনুমতি মিললেও, 'কো-এডুকেশন' স্কুল অথবা কলেজে পড়া ছিল বারণ।

সুস্মেলীর নিজের কথায়, 'বর্ণপরিচয় আমি পড়েছি। কিন্তু আমাদের পরিবারে রক্ষণশীলতার কারণে নারীশিক্ষার ব্যাপারটা অনেকক্ষেত্রেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। তৎকালে মানে ঊনবিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে পিতৃতান্ত্রিক শাসন এর অন্যতম কারণ। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আমার মায়েরা সে সব দিনের রক্ষণশীলতার মূল্য দিয়েছেন। তাঁদের সময়ে এবং আমাদেরকেও 'কো-এডুকেশন' ব্যবস্থা আছে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে দেওয়া হয়নি। বাড়িতে নাচ করার অধিকার ছিল কিন্তু বিয়ের পর আর নাচের অনুমতি মিলত না। নারী-পুরুষের তথাকথিত সম্পর্কের বাইরে যে বন্ধু হতে পারে, বিষয়টা আমাদের বাড়ির পুরুষরা বুঝতে চাইতেন না। এই ধরনের অসংখ্য উদাহারণ দেওয়া যায়। বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা আমাদের মুক্তি দিয়েছে। আমরা কথা বলার অধিকার পেয়েছি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। মুক্তির আলো পেয়েছি দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে।'

বিনয় ঘোষ লিখছেন, 'আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে এদেশের ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত বিদ্যার যোগসূত্র স্থাপন এবং বাংলা শিক্ষা প্রচলন শিক্ষাক্ষেত্রে এই দুটি হল বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্তি। তাঁর অন্য কীর্তি হল, এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা। ১৮৪৯-৫০ সালে ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুনের অন্যতম সহযোগীরূপে তিনি বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। আগেকার অনেক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার কোনো সামাজিক অন্তরায় তখনো দূর হয়নি। অথচ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রায় দুই পুরুষ ধরে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন চর্চা চলেছে।' (বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ-বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা- ২১১)

কলকাতার বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের প্রথম সচিব মহঃ মাফাখারুল ইকবাল মনে করেন বাঙালির কাছে বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন আলোক বর্তিকা। তিনি বলছেন, 'বাঙালির জন্য বিদ্যাসাগর ছিলেন আশীর্বাদ। ওনার আদর্শিক, সাংস্কৃতিক এবং চারিত্রিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিদ্যাসাগরকে বাঙালি এখনও অনুকরণ করে। এবং অনুসরণ করে। বিদ্যাসাগর কখনো আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। বিদ্যাসাগরকে কোনও একক গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যাবে না। সারা বিশ্বের বাঙালি তথা মানবজাতি তাঁর আদর্শিক দিকগুলিকে স্মরণ রাখবে। তাঁর মাতৃভক্তি এবং দেশভক্তি উদাহারণযোগ্য।'

ইংরেজি সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙালি সাহিত্যিক অমিত চৌধুরীর বক্তব্যেও আমরা সেই সূত্র এবং মূল্যায়ন খুঁজে পাই। তিনি বলছেন, ওনারমতো আদর্শবাদী এবং উদার মানুষ কম জন্মগ্রহণ করেছেন। নিজের মতের সঙ্গে মিল না হলে সেটা মেনে নিতে পারতেন এবং আলোচনা করতে পারতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় রেনেসাঁর দু'জন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মাইকেল মধুসূদন বন্ধু বিদ্যাসাগরকে ছোট

করে 'ভিদ' বলে ডাকতেন। 'বর্ণপরিচয়'-এর বাইরেও তাঁর ভালো ব্যবহারের কথা বলতে হয়। এই সব ব্যক্তিদের কথা আমরা যত বেশি আলোচনা করব তত এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারব।

আমরা এই প্রজন্মের একজনের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম ওর কাছে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে। ওর নাম সুমনা চ্যাটার্জী। সুমনা কলকাতার শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ-এর ইংরেজি সাহিত্যের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। সুমনা বলছে, 'বাংলা বর্ণমালার মূল রূপকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর অসাধারণ বিবেচনাবোধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলেন বর্ণপরিচয়। প্রথমে দু'টি বর্ণের শব্দ, তারপর তিনটি, এভাবেই ধীরে ধীরে আ-কার, ই-কার, ঈ-কার এবং তারপর মিশ্র শব্দ। তারপর শুরু হল বাক্য গঠনের সূচনা পর্বের। আস্তে আস্তে একটি শিশু সিঁড়ির মতো এক-একটি ধাপ পেরিয়ে এসে শব্দ শেখে। শেখে তার প্রয়োগ। এবং সেই শিশু পরিণত হয়ে শেখে ছোট বাক্যের ছোট ছোট প্রাঞ্জল গদ্য রচনা। পাশাপাশি তিনি একজন সমাজ সংস্কারক। পিতামাতার প্রতি তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি এবং বজ্রকঠিন চরিত্রবলয় বাংলায় প্রবাদপ্রতিম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মশক্তি ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।'

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে সেই সময় স্কুলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের মেয়েদের ভর্তি নেওয়া যাবে বেথুন এই নিয়ম চালু করেছিলেন। উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে। ইংরেজি শিক্ষার আদলে। এই ব্যবস্থায় বেথুনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আন্তরিকভাবেই সহযোগিতা করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা মত পোষণ করেন। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন সংস্থা সাহিত্য অ্যাকাদেমি, ওই সংস্থার কলকাতার আঞ্চলিক সচিব দেবেন্দ্র দেবেশ বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে এই বক্তব্য টেনে মৃদু সমালোচনা করলেন। তিনি বলেন, 'শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান অস্বীকার করা যাবে না। আমি বিহারী হিসেবে 'বর্ণপরিচয়' পড়িনি। তবে বড় হয়ে যুগপুরুষ বিদ্যাসাগরকে চিনেছি। বিধবা বিবাহ আইনের জন্যও তাকে আমাদের মনে রাখতে হবে। শিক্ষা, সংস্কৃতি সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি সর্বভারতীয় এবং সার্বজনীন ভূমিকা নিয়েছিলেন। শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকার তাঁর কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য বা মতামত নিয়ে কিছুটা বিতর্কও আছে। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথা বললাম। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে সাহিত্য আকাদেমি থেকে আমরা বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করব। মেদিনীপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নভেম্বর মাসে দু'দিনের সেমিনার করার প্রস্তাব আছে।'

বিধবা বিবাহ, বহু বিবাহ, এবং বাল্য বিবাহের মতো তথাকথিত সমাজের সামাজিক অধিকারের ব্যাপারে তিনি গর্জে উঠেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মানদণ্ডে সেই সময় স্কুলে সম্ভ্রান্ত হিন্দুপরিবারের মেয়েদের ভর্তি নেওয়া যাবে বেথুন এই নিয়ম চালু করেছিলেন। উচ্চবিত্ত হিন্দু পরিবারের মধ্যেই স্ত্রীশিক্ষা সীমাবদ্ধ থাকবে। ইংরেজি শিক্ষার আদলে। এই ব্যবস্থায় বেথুনের সঙ্গে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আন্তরিকভাবেই সহযোগিতা করেছিলেন বলে ইতিহাসবিদরা মত পোষণ করেন।

আমরা ভাষা শিখেছি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। মেয়েদের জন্য কাজ, মেয়েদের শিক্ষার জন্য কাজ তাঁকে চিরন্তন করে রেখেছে আমাদের কাছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। নতুন কাজ করবার জন্য সমাজে এসেছিলেন তিনি। এঁরা আসেন। সে সময়ের সমাজপতিরা তাঁর কাজকে বুঝতে চাননি। বা বুঝতে পারেননি। সেই কারণে তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান।

'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা তদবিষয়ক প্রস্তাব' এই বিষয়ে দ্বিতীয় বই, ১৮৫৫ সালে প্রকাশ হয়। এবং এই বই প্রকাশের চোদ্দো মাসের মধ্যে বিধবা বিবাহ আইন অনুমোদন করে ব্রিটিশ সরকার। প্রথম বিধবা বিয়ের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ ডিসেম্বর।

কবি জয় গোস্বামী বললেন, 'আমরা ভাষা শিখেছি বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে। মেয়েদের জন্য কাজ, মেয়েদের শিক্ষার জন্য কাজ তাঁকে চিরন্তন করে রেখেছে আমাদের কাছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেছিলেন বিদ্যাসাগর। নতুন কাজ করবার জন্যা সমাজে এসেছিলেন তিনি। এঁরা আসেন। সে সময়ের সমাজপতিরা তাঁর কাজকে বুঝতে চাননি। বা বুঝতে পারেননি। সেই কারণে তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে চলে যান। বিদ্যাসাগরের মতো ব্যক্তিত্ব আমাদের সমাজে আর আসেননি। তাঁকে আমাদের আজও প্রয়োজন আছে। তাঁর দ্বিশতবার্ষিকীতে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন।'

কবি সুবোধ সরকার বিদ্যাসাগরকে নিয়ে গর্বিত। তিনি বলেন, 'বিদ্যাসাগর নিজের সময় থেকে অনেকটা এগিয়ে ছিলেন। ইংরেজিতে যাকে 'ভিশনারি' বলে। তিনি যেভাবে মেয়েদের বেদনাকে স্পর্শ করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন, সেভাবে আজ পর্যন্ত কোনও পুরুষ বুঝতে পারেননি। তিনি মেয়েদের জন্য যা করেছেন শুধু তাঁর জন্যই তিনি অমর হয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি যে বাংলা গদ্য লিখে গেছেন, তাঁর জন্য তিনি দ্বিতীয়বার অমর হলেন।'

আমরা কথা বলেছিলাম অধ্যাপক স্বপন চক্রবর্তীর সঙ্গে। অধ্যাপক চক্রবর্তী কলকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির ডিরেক্টর জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন। পরে তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ডিস্টিংগুইশড' মানবিকী বিদ্যার চেয়ারের পদে ছিলেন। চলতি বছরের ৩১ জুলাই অধাপক স্বপন চক্রবর্তী কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন।

তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আধুনিক ভারতীয় এবং আধুনিক মানুষ ছিলেন বললে কিছুই বলা হয় না। তাঁর সব উদ্‌যোগের পিছনে ছিল এক বিজিত জাতির নারী-পুরুষের অবসিত বিষয়ীসততা এবং স্বাভীপ্সার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি যেমন শাস্ত্রের সমর্থন জোগাড় করেছিলেন, তেমনই বিদেশী শাসকদের আইন-সংস্কারে একরকম বাধ্য করতে পেরেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলন, আধুনিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন, নারীশিক্ষার প্রসার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার বাণিজ্যে বিনিয়োগ, বর্ণমালা ও ভাষার সংস্কার—তাঁর সমস্ত প্রকল্পের গতিমুখ ছিল পরাশ্রিত দেশের ব্যক্তিমানুষকে মুক্ত বিষয়ী করে তোলা, আপন ইতিহাস নির্মাণে অধিকারী বলে প্রতিপন্ন করা। বিদ্যাসাগর আমাদের চিন্তামুক্তির সাধনায়, জাতিসত্তা নির্মাণের সাধনায় এ কারণেই এক অগ্রপথিক। এ কথা না বুঝলে তাঁর ত্যাগ ও করুণা কেবলমাত্র সদাশয়ের হিতাকাঙ্খায় সীমাবদ্ধ বলে মনে হবে।

কবি, অনুবাদক, ফরাসী ভাষার অন্যতম ভারতীয় অনুবাদক অধ্যাপক চিন্ময় গুহ শুরুটাই করলেন দুঃখ, কষ্ট এবং বেদনার সমন্বয় করে। তাঁর মা অসুস্থ। হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাই তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে আশ্রয় খুঁজলেন। বললেন, 'আমার মা অসুস্থ, এইসময় বিদ্যাসাগরের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। আমরা তো কেউই জীবন ও কর্মকে তাঁর মতো করে মিলিয়ে দিতে পারিনি। তাঁর মতো করে এক তরঙ্গ দ্রাঘিমায় মিলিয়ে দিতে পারিনি। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তিনি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের যে কাজ শুরু করেছিলেন, তা শেষ হয়নি। তাঁর দৃষ্টির সামনে আমাদের কারও দাঁড়ানোর যোগ্যতা নেই।'

বর্তমান সময়ের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, মানবতাবাদী লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলছেন, বিদ্যাসাগর এমন একটি ব্যক্তিত্ব যার সঙ্গে অন্যদের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ তিনি ছিলেন সর্বার্থে একজন পূর্ণ মানুষ।

জনপ্রিয় সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'বিদ্যাসাগর এমন একটি চরিত্র যার সঙ্গে বাঙালির চরিত্র মেলে না। এত দৃঢ়চেতা, সময়নিষ্ঠ ও এত ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ মানুষ বাঙালির মধ্যে তেমনটা আর নেই। তার ওপরে তিনি যেমন দানশীল ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন যুক্তিবাদী, বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন একজন পূর্ণ মানুষ। বিদ্যাসাগর নিজে খুব নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করতেন। এবং তিনি একজন সংযমী মানুষ। আবার অন্যদিকে বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কতবার সাহায্য করেছেন তার হিসেব নেই। শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে যাঁদের বুঝি তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্যই একটি দৃষ্টান্ত।'

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যতা, বলিষ্ঠতা এবং মহত্ব তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। এমনটা দাবি করেন আধুনিক ইতিহাসবিদেরা। তাঁর মননের উদাহারণ আমরা পাই গোপাল এবং রাখালের গল্পে। গোপাল যেমন সুবোধ বালক, রাখাল তেমনটা একদমই নয়। রাখালকে আমরা দুষ্টু ছেলে হিসেবে পাই বিদ্যাসাগরের কলমে। কিন্তু তিনি রাখালের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি কিছু বলেননি। বলতে চাননি। কারণ সম্ভবত মানুষ যে অবস্থানেরই হোক, যতই ছোট হোক, তবুও সে মানুষ। রাখালদেরও আত্মসম্মানবোধ আছে। যে কোনও মানুষকে অপমান করলে বিদ্যাসাগর রেগে যেতেন।তাঁর উপলব্ধি ছিল, রাখালদেরমতো দুষ্টু বালকদের আত্মচেতনা জাগিয়ে তোলার কাজ আমাদেরই করতে হবে। সেই কাজও বিদ্যাসাগর সাবলীলভাবে করতে চেষ্টা করেছিলেন। আলোকিত দার্শনিকের সেই পথের সন্ধানে বন্ধ হয়ে থাকা জানলাগুলো সত্য উত্তর সময়ে খুলে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে আমাদেরই।

বিদ্যাসাগর এমন একটি চরিত্র যার সঙ্গে বাঙালির চরিত্র মেলে না। এত দৃঢ়চেতা, সময়নিষ্ঠ ও এত ব্যক্তিত্বসম্পূর্ণ মানুষ বাঙালির মধ্যে তেমনটা আর নেই। তার ওপরে তিনি যেমন দানশীল ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন যুক্তিবাদী, বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন একজন পূর্ণ মানুষ। বিদ্যাসাগর নিজে খুব নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করতেন। এবং তিনি একজন সংযমী মানুষ। আবার অন্যদিকে বন্ধু মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কতবার সাহায্য করেছেন তার হিসেব নেই। শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলে যাঁদের বুঝি তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্যই একটি দৃষ্টান্ত।

# জীবনপঞ্জি

| | |
|---|---|
| ১৮২০ | ২৬ সেপ্টেম্বর (বাংলা ১২ আশ্বিন, ১২২৭) মঙ্গলবার তৎকালীন হুগলি জেলার (বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের) ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। তাঁর প্রপিতামহের নাম ছিল ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার। ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের তৃতীয় পুত্র ছিলেন রামজয় তর্কভূষণ। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা। তাঁর মায়ের নাম ভগবতী দেবী। |
| ১৮২৫-২৭ | পাঁচ বছর বয়সে বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় লেখা-পড়া শুরু করেন এবং একাদিক্রমে তিন বছরে চার বছরের পাঠ সাঙ্গ করেন। |
| ১৮২৮ | পিতার সঙ্গে পদব্রজে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে কলকাতায় আসেন। |
| ১.৬.১৮২৯ | কলিকাতার রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন। |
| ১৮৩০ | মার্চ মাস থেকে ৫ টাকা করে বৃত্তি লাভ করেন। |
| ১৮৩১ | এগারো বছর বয়সে তাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়। |
| ১৮৩৪ | ক্ষীরপাই নিবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের কন্যা দিনময়ী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবেশ। |
| ২২.৪.১৮৩৯ | হিন্দু ল কমিটির পরীক্ষা দান। ন্যায় শ্রেণীতে ভর্তি। পড়তে হয়েছে ভাষা, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী, ন্যায়। |
| ১৫.৫.১৮৩৯ | পাঠদ্দশায় ল-পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে হিন্দু ল কমিটি কর্তৃক প্রশংসাপত্র লাভ। |
| ১৮৪০-৪১ | ১লা ডিসেম্বর গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচ মাস অধ্যয়নান্তে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ। ২৯ ডিসেম্বর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। এ সময় থেকে বিদ্যাসাগর রীতিমতো ইংরেজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। |
| ১৮৪৪ | বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ পরিদর্শনকালে কলেজের প্রধান মার্শাল সাহেব তাঁর সঙ্গে তরুণ শিক্ষক বিদ্যাসাগরের পরিচয় করিয়ে দেন। ঐ সাক্ষাৎকারে বিদ্যাসাগরের পরামর্শে হার্ডিঞ্জ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ১০১টি বাংলা বিদ্যালয় খোলার নির্দেশ দেন। |
| ১৮৪৬ | ৬ এপ্রিল : সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদে যোগদান করেন। যোগ দিয়েই কলেজের পাঠক্রম ও পাঠন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাঁধে। |
| ১৮৪৭ | সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র ও প্রেস ডিপোজিটারির প্রতিষ্ঠা বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে। |
| ১৮৪৮ | ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস (মার্সম্যানের গ্রন্থের অনুবাদ) রচনা। |
| ১৮৪৯ | ১লা মার্চ : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'হেড রাইটার ও ট্রেজারার' পদে যোগদান। |
| ১৮৫০ | বেথুন প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল'-এর অবৈতনিক সম্পাদক ও সংগঠক। |
| ১৮৫১ | ৫ই জানুয়ারি : সংস্কৃত কলেজে মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে অধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হন। কর্তৃপক্ষ তাঁকে সর্বাত্মক ক্ষমতা দেন তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য। |
| ১৮৫৩ | বীরসিংহ গ্রামে নিজ ব্যয়ে অবৈতনিক বিদ্যালয়, সান্ধ্য বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। |
| ১৮৫৪ | বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শিক্ষা পরিষদের কাছে বিস্তৃত নোট দেন। |
| ১৮৫৫ | বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্য, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতার সঙ্গে দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক; সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক পরিশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন। বিধবা বিবাহ আইনসম্মত করার জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন। বহু বিবাহ রহিত করার আবেদন। |
| ১৮৫৬ | ২৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ; বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফল লাভ। |
| ১৮৫৭ | বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় ৯টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। |
| ১৮৫৮ | শিক্ষানীতির পরিবর্তিত রূপে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। |
| ১৮৬০ | সরকারের সঙ্গে শিক্ষা সংস্কারে মতানৈক্য হেতু বোর্ড অব্ এগজামিনারস-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। |
| ১৮৬৪ | কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল-এর নাম পরিবর্তিত হয় 'কলিকাতা মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন' নামে। |
| ১৮৬৬ | বহুবিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য গভর্নর জেনারেলের ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন। |
| ১৮৬৬-৬৭ | দক্ষিণবঙ্গে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাঁর গ্রাম বীরসিংহে অন্নছত্র খুলে দেন বিদ্যাসাগর। |
| ১৮৭০ | ১১ই আগস্ট একমাত্র পুত্র ২২ বছর বয়স্ক নারায়ণ চন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৪ বছর বয়স্কা বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর বিবাহ হয় কলকাতার বাড়িতে। পরিবারের কেউ-ই যোগ দেননি। তিনি একাই বিবাহকার্য সম্পাদন করেন। |
| ১৮৭১ | ১২ই এপ্রিল কাশীতে তাঁর মাতার মৃত্যু হয়। |
| ১৮৭১-৭২ | এই সময় তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির দরুণ, জল হাওয়া পরিবর্তনের জন্য সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কার্মাটারে (অধুনা বিদ্যাসাগর স্টেশন) একটি বাগানবাড়ি ক্রয় করেন (১৮৭১) এবং কিছুদিন স্বাস্থোদ্ধারার্থে বসবাস করেন। দরিদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। (১৮৭২)। |
| ১৮৭২ | ১৫ই জুন বিদ্যাসাগরেরই প্রাণপণ চেষ্টায় বিধবাদের সাহায্যার্থে 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠিত হয়। |
| ১৮৭৫ | ৩১ মে, সম্পত্তির উইল তৈরি করলেন। উইলের দ্বারা সম্পত্তির অর্জিত অর্থ তিনি ৪৫ জন বৃক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দিলেন। |
| ১৮৭৬ | পিতার অনুমতি নিয়ে কলকাতার বাদুড়বাগানে ২৫, বৃন্দাবন মল্লিক লেনে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করেন। |
| ১৮৭৭ | জানুয়ারি, বাদুড় বাগানে নবনির্মিত ভবনে বাসারম্ভ। |
| ১৮৮২ | রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর বাদুর বাগানের বাড়িতে আসেন। মেট্রোপলিটন কলেজে ল কোর্স পড়ানো শুরু হয়। |
| ১৮৮৫ | মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের বহু বাজার শাখা খোলা হয়। |
| ১৮৮৮ | ১৩ই আগস্ট স্ত্রী দীনময়ী দেবীর মৃত্যু হয়। |
| ১৮৯০ | জামাতা বীরসিংহ গ্রামে ভগবতী দেবীর নামে 'ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন। |
| ১৮৯১ | ২৮শে জুলাই রাত ২ টো বেজে ১৮ মিনিটে মহাপ্রয়াণ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর ১০ মাস ৩ দিন। ৩০শে জুলাই সূর্যোদয়ের প্রাক মুহূর্তে অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হয় কলকাতার নিমতলা মহাশ্মশানে। |

## রেড রোডে পুজো কার্নিভাল, ২০১৯

চলচ্চিত্র উৎসবে শাহরুখ খান ও
সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী।